অজন্তা

প্রহরী

অজন্তার প্রথম গুহার চিত্র হইতে

অজন্তা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্—কলিকাতা

১৩২০

PRINTED BY MANORANJAN SARKAR, AT THE SWARNA PRESS, *37, Mechuabazar Street, Calcutta.* PUBLISHED BY D. N. BHATTACHARYYA OF MESSRS. BHATTACHARYYA & SON, *65, College Street, Calcutta.*

মূল্য এক টাকা।

আমার নদিদিমা

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর

শ্রীচরণকমলে—
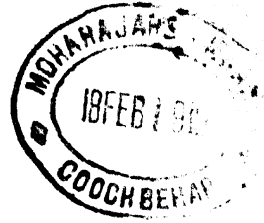
ভূমিকা

ভারতচিত্র-শিল্পের শেষ দীপাবলী যেখানে আজও বিচিত্রচ্ছটা বিস্তার করিতেছে—বৌদ্ধ-যুগের সেই অজন্তা গিরিগুহায় আর বৈদ্যুতিক আলোকপ্রখর এই নব্য বাঙ্গালায় ব্যবধান বিস্তর—পথের ব্যবধান, কালের ব্যবধান, সভ্যতা ভব্যতা উভয়েরই ব্যবধান; সুতরাং অজন্তার চিত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটাইতে হইলে শুধু শুনিয়া নয় সেটা দেখিয়া বোঝাও প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমান্ নন্দলাল ও অসিতকুমার প্রমুখ বাঙ্গালার তরুণ শিল্পিগণ অজন্তার তীর্থমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সেই তীর্থযাত্রারই ইতিহাস। এই ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হয়তো প্রাচীন ভারতের নির্ব্বাপিত-প্রায় সেই প্রদীপের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িবে—যে প্রদীপের শিখা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশান্ত এবং যাহার আলোক বিদ্যুতের মত তীব্রও নয়—নয়নের পীড়াও দেয় না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ব্বাভাস

কলিকাতা গভর্মেণ্ট শিল্প-বিত্তালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক Mr. E. B. Havell সাহেবের বন্ধু Dr. W. Herringhamএর পত্নী বিলাতের বিখ্যাত মহিলা-চিত্র-শিল্পী Mrs. C. J. Herringham ১৯০৯ সালের ডিসেম্বার মাসে অজন্তা গুহাচিত্রাবলীর নকল নেবার জন্য বিলাত থেকে আসেন। তাঁর সঙ্গে বিলাত থেকে Miss Devis নাম্নী আর একজন মহিলা শিল্পীও এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় শিল্প-গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুজ্ঞাক্রমে "ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য শিল্প সমিতির" (The Indian Society of Oriental Art) তরফ্ থেকে Mrs. Herringhamএর সাহায্যের জন্য প্রেরিত হই। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁহার পত্নী, Sister Nivedita ও Sister Christianaর সঙ্গে Mrs. Herringhamএর পূর্ব্বে পরিচয় থাকায় সেই সময় বড়দিনের অবকাশে নিমন্ত্রিত হ'য়ে তাঁরা সেখানে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে যান। সেখানে আচার্য্য বসু, তাঁহার পত্নী ও Sister Nivedita আমাদের উভয়ের যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন করেন এবং তাঁদেরই পরামর্শে Mrs. Herringham আমাদের অপর তুইজন সতীর্থ-শিল্পী শ্রীযুক্ত কে, ভেক্কাটাপ্পা ও

পূর্ব্বাভাস

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ গুপ্তকে কলিকাতা থেকে শিল্প-গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের সাহায্যে আনিয়ে নেন। আমাদের কলিকাতা থেকে অজন্তা যাওয়ার ব্যয়ভার শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়েরা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা তিন মাসকাল সেখানে অজন্তার ছবির প্রতিলিপি নেওয়ার কাজে ব্যাপৃত ছিলুম। পরবৎসর ১৯১০ সালের ডিসেম্বার মাসে Mrs. Herringham পুনরায় প্রতিলিপির জন্য বিলেত থেকে অজন্তায় আসেন। আমি এবং শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ গুপ্ত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পুনরায় প্রেরিত হই। দুই বৎসরই Mrs. Herringham হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্টের সাহায্যে সৈয়েদ আহাম্মাদ্ ও ফজ্‌লউদ্দিন কাজি নামক দুইজন শিল্পীকে আওরাঙ্গা-বাদ থেকে আনিয়েছিলেন। এবৎসরও Mrs. Herring-hamএর সঙ্গে বিলাত থেকে Miss Larcher ও Miss Luke নাম্নী দুইজন মহিলা শিল্পী এসেছিলেন। হায়দ্রাবাদ গভর্মেণ্ট Mrs. Herringhamএর তাঁবু (Camp) রক্ষার জন্যে পুলিস পাহারা প্রভৃতি যাবতীয় সুবন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। সেই সুদূর দাক্ষিণাত্যে আত্ম-বন্ধুহীন স্থানে স্নেহশীলা ইংরাজমহিলা Mrs. Herringham আমাদের সকলকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহসিঞ্চিত ক'রেছিলেন তা' আমরা

পূর্ব্বাভাস

এ জীবনে কখনও ভুল্‌বনা। আচার্য্য বসু ও Sister Nivedita প্রভৃতির সঙ্গে আর একজন অজন্তায় গিয়েছিলেন—সেই জনহীন পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁর সঙ্গ এতই তৃপ্তিদায়ক হ'য়েছিল যে সেকথা আমাদের চিরকাল মনে থাক্‌বে—তিনি উদ্বোধনের কার্য্যাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই গৃহীত ফটোগ্রাফ্‌ থেকে আমরা এই পুস্তিকায় কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি প্রকাশ কর্‌লুম।

অজন্তা গুহাগুলি ইন্ধ্যাদ্রির নির্জ্জনকন্দরে কতদিন পূর্ব্বে যে খোদিত হ'য়েছিল এ বিষয়ে কেহ এখনও স্থির মীমাংসায় এসে পৌঁছতে পারেননি। তবে, Mr. J. Fergusson, Mr. J. Griffiths প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও শিল্পী মহোদয়েরা ইহার নির্ম্মাণ-কাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২য় থেকে ৫ম শতাব্দ ব'লে নির্দ্ধারণ করেন এবং অঙ্কিত চিত্রগুলি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২য় কিম্বা ১ম হইতে ৭ম খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত হ'য়েছিল ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অজন্তার চিত্র-ভাণ্ডারের কথা মোগলসম্রাটদের বা সেই সময়ের লোকেদের একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল। এ সম্বন্ধে মোগল আমলের ইতিহাসে কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না। শোনাযায়, প্রায় শতাব্দ-পূর্ব্বে একজন পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী শিকার-ক্রীড়া উপলক্ষ্যে পূর্ব্ব-খান্দেশের ঐ ইন্ধ্যাদ্রিতে গিয়েছিলেন। পথভ্রষ্ট হ'য়ে সেই জনহীন

পূর্ব্বাভাস

ব্যাঘ্রসঙ্কুল পর্ব্বত-প্রাচীরপরিবেষ্টিত প্রদেশে দৈবক্রমে গিয়ে পড়েন এবং তিনি ঐ সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্বংসোন্মুখ গুহাগুলির কয়েকটি কার্ণিশের অভাবনীয় মনোহর কারুশিল্প দেখে বিস্মিত হ'ন এবং তিনিই ঐ লুপ্তপ্রায় শিল্প-ভাণ্ডারের বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরই সেই অমূল্য আবিষ্কারের ফলে আজ আমরা এমন বিরাট শিল্প-সম্পদের দর্শনলাভ কর্‌তে পেরেচি। Secretary for the State of India in Council থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বম্বে গভর্মেণ্ট-শিল্প-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ Mr. Griffiths তাঁর কয়েকটি শিষ্য সমভিব্যাহারে চিত্রের প্রতিলিপি নেবার জন্যে অজন্তায় গিয়েছিলেন। ঐ সকল চিত্রের নকলগুলি বিলাতের কৌতুকাগারে (British Museum) রক্ষা করা হ'য়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছবিগুলি অগ্নি-সংযোগে কতক দগ্ধ ও কতক অর্দ্ধদগ্ধ হ'য়ে গেছে। Mr. Griffiths ভারত-গভর্ণমেন্টের সাহায্যে "The Paintings in the Buddhist Cave-Temples of Ajanta" নামক দুখণ্ড সুবৃহৎ সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। Mr. Griffithsএর প্রকাশিত পুস্তকের রঙিন ছবিগুলি ছাপার দোষেই হোক বা অঙ্কনপটুতার অভাবেই হোক ঠিক যথাযথ হ'য়েচে ব'লে বোধ হয় না। Mrs. Herring-ham ও এবিষয়ে আমাদের বল্‌তেন যে, বিলাতের

পূর্ব্বাভাস

কৌতুকাগারে Mr. Griffithsএর যে কয়েকটি ছবি অগ্নির গ্রাস হ'তে বেঁচে গেছে সেগুলি থেকে আসল ছবির কদাচিৎ আভাস পাওয়া যায়। Mrs. Herringham লুপ্তপ্রায় চিত্রগুলির যতদূর সম্ভব নির্ভূল প্রতিলিপি নেবার জন্যে নিজব্যয়ে বৃদ্ধবয়সে এত দূরদেশে এসেছিলেন এবং সেই বাদুড় পেঁচার দুর্গন্ধপূর্ণ গুহার ভিতর নকলের কাজ কিরূপ অপরিসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে করেছিলেন, একথা মনে হ'লে বাস্তবিকই বিস্মিত হ'তে হয়!

তিনি যে বৃথা কৌতুহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে এদেশে এসেছিলেন তা নয়, অজন্তার লোকবিশ্রুত শিল্প-কলা তাঁর অন্তরে একটা মহান্ ভাব, গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়ে একটা গৌরব মহিমার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিল তারই প্রণোদনে তিনি বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্ধ্যাদ্রিমূলে এসে এই সুকঠোর কাজে হাত দিয়ে তা সুসংসিদ্ধ করে গেছেন। বিলাতে ফিরে গিয়ে তিনি "The English woman" এ The Caves of Ajanta নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লিখেচেন—

"একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অজন্তার প্রাচীর-গাত্রা-ঙ্কিত চিত্রগুলির অন্তর্নিহিত-আকর্ষনের কথা ছেড়ে দিলেও জগতের শিল্পকলার ইতিহাসে সেগুলি সম্পূর্ণ অভিনব অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান লাভ করেচে। ... ... অতি সূক্ষ্ম পর্য্যাবেক্ষন ও জাতিবর্ণগত পার্থক্য-

গুলি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলাই অজন্তা শিল্পের বিশেষত্ব। ... ...

শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রভৃতি সমসাময়িক কাব্যনাটকাদি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লে একই ধরণের বিষয়ের সব চিত্র সেখানে ভাষায় বর্ণিত দেখ্‌তে পাই। অভিজাত ও জনসাধারণ তাদের বেশভূষা, আমোদ-প্রমোদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দরবার-মিছিল, রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদকক্ষ, পদ্ম-সরোবর এবং নানাবিধ সুপরিচিত পশুপক্ষী সমেত সব যেন আমাদের চোখের সাম্‌নে জীবন্তভাবে ফুটে ওঠে!"

অজন্তার বিষয় লিখ্‌তে গেলে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিখিত বিষয়ের চেয়ে আরও অনেক কথাই লেখা যায়। কিন্তু, সেই বিরাট শিল্পকলার অফুরন্ত ইতিহাস এই সঙ্কীর্ণ স্থানে সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব শুধু দেশের লোকের কাছে দেশের শিল্পের পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে আমার ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-গুলিকে যথাসম্ভব সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ কর্‌চি। এই পুস্তক পাঠে সুধী পাঠকগণ যদি সেই প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-ভাণ্ডারের বিরাটত্ব ও অনুপম ভাব-সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও উপলব্ধি কর্‌তে পারেন তবে আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান কর্‌ব।

পাঠকদের অজন্তার বিষয় প্রত্যক্ষভাবে বোঝাবার জন্যে যথাসম্ভব কয়েকটি ভাল ভাল চিত্রের প্রতিলিপি

দিলুম। কিন্তু, পাঁচ ছয় ফুট ও তার চেয়েও বড় বড় ছবিগুলির ক্ষুদ্র প্রতিলিপি ছাপার নানান্ ত্রুটির ভিতর দিয়ে গ্রন্থের সঙ্কীর্ণ পত্রে প্রকাশ করতে হ'লে তার যে মূল সৌন্দর্য্য অতি অল্পই বজায় থাকে তা বলাই বাহুল্য। মেদিনীপুরে প্রাপ্ত পটের ছবিটি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও জীর্ণ-মলিন হওয়ায় তার প্রতিলিপিটি সন্তোষজনক হয়নি। কালীঘাটের পটটির রেখানৈপুণ্য প্রতিলিপিতে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুল্‌তে পারা যায়নি এবং সেই কারণে অজন্তার রেখাঙ্কন পদ্ধতির সঙ্গে তার রেখাঙ্কন পদ্ধতির যে কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য সেটা সম্পূর্ণরূপে দেখাতে পারা গেল না। প্রতিলিপিতে ছবির যেটুকু সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় মূলছবিতে সৌন্দর্য্য তার চেয়ে যে কত বেশী থাকে তা বোধ করি বোঝাবার প্রয়োজন নেই। অজন্তার ছবি রংএর জন্যে বিখ্যাত; কিন্তু একবর্ণের বা কেবল রেখাঙ্কিত প্রতিলিপিতে মূলের সে সৌন্দর্য্য অল্পই বোঝা যাবে।

গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপটে যে একটি আলঙ্কারিক চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েচে সেটি অজন্তা-গুহার ছাদের খোদিত কারু-শিল্প-খচিত চন্দ্রাতপ হতে নেওয়া। পাঠক-গণ এথেকে অজন্তার আলঙ্কারিক শিল্প-সৌকার্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাবেন।

পরমপূজনীয়া ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহে আমি প্রথমে অজন্তার বিষয় ভারতীতে

লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হই। তিনি আমায় ভারতীতে প্রকাশিত অজন্তার ছবিগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে যে ঋণে বদ্ধ করেছেন তা' অপরিশোধ্য। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'অজন্তার' ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর সংগৃহীত মেদিনীপুরের প্রাচীন পটটির প্রতিলিপি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার রায় মহাশয়েরা আমায় এই পুস্তকটি রচনায় নানান্ তথ্য প্রদান করেছেন এবং এঁদের একান্ত যত্নে আমার এই পুস্তকটি আজ সর্ব্ব-সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হ'ল।

প্রবাসীসম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে প্রকাশিত কয়েকটি অজন্তার চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। Mr. E. B Havell, Mrs. C. J. Herringham, Dr. A. K. Coomaraswamy, Mr. Griffiths, Mr. Grünwedel মহোদয়গণের পুস্তক থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি আমার পুস্তকপ্রকাশে অশেষবিধ সাহায্য করেছেন। আমি

পূর্ব্বাভাস

উল্লিখিত সকল মহোদয়গণের সহায়তা ও অনুগ্রহের জন্য তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

পরিশেষে, Mr. Havell, Dr. Coomaraswamy প্রভৃতির গ্রন্থাদি থেকে আমি কতক অংশ স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত তর্জ্জমা করে উদ্ধৃত করেচি, পরিশিষ্টে তার মূল অংশগুলিও সংযোজিত করে দেওয়া গেল। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমাদের চিন্তা ও ধারণা-প্রণালী এরূপ ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েচে যে আমরা আমাদের দেশীয় জিনিসকে চিন্‌তে হলেও ঠিক সেই দিক দিয়ে ও সেই আলোকে না দেখ্‌লে সেটা স্বাধীনভাবে সম্যক্ গ্রহণ কর্‌তে পারিনে।

তর্জ্জমায় অনেক সময় প্রয়োজনমত অর্থ করা হয়; সেই কারণেও মূল অংশগুলি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলুম। পাঠকগণ মূল থেকে প্রকৃত ভাবটি অতি সহজে ও সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারবেন।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।
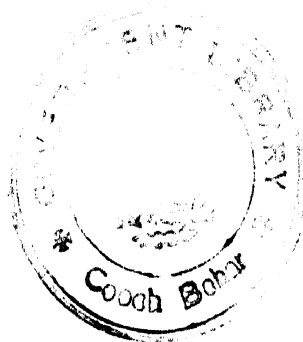
পরিচয়

পরিচয়

অজন্তা যাবার পথে জালগাঁও ষ্টেশন থেকে ৩৫ মাইল প্রায় তরুবিহীন জন-শূন্য মরু!—অনেক দূর ব্যবধানে এক একটি ছোট গ্রাম;—তরঙ্গায়িত পার্ব্বত্য পথ। আশৈশব কল্‌কাতার ইটের বেড়া, জনকোলাহল ও কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ থেকে যখন সেই চির-নগ্ন মাঠের চির-উন্মুক্ত পথে এসে পড়লুম, তখন আমাদের আর আনন্দ দেখে কে! গুহাগুলি ইন্দ্ৰয়াদ্রির গাত্রে খোদা। এই পর্ব্বতটী দাক্ষিণাত্য ও খান্দেশের ঠিক সীমান্তে অবস্থিত। পথে যেতে যেতে দু এক জায়গায় বহু পুরাতন ইটের তৈরী বৌদ্ধ স্তূপ এবং স্তম্ভ চোখে পড়ে। সেগুলি যেন প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য-স্বরূপ, কিম্বা শিল্প-তীর্থ-যাত্রীদের পথসমুদ্রের কাণ্ডারীর মত শতজীর্ণ দেহভার নিয়ে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। তাতেও শিল্পকলার নিদর্শন অল্পবিস্তর এখনও পাওয়া যায়। পথে যে সকল গ্রাম অতিক্রম করলুম সেগুলি প্রায় একভাবে গঠিত—অর্থাৎ প্রতিগ্রামে এক একটি হনুমানজীর মন্দির, সেখানকার জমীদার বা "পাটেল" সাহেবের একটি প্রাসাদ আর দশ কুড়িটি কুটীর ও ক্ষুদ্র পাকা ইমারৎ।

কোন কোন গ্রামে অতিরিক্তের মধ্যে একটী বাজার! অন্য অন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক সেখানে গিয়ে বেচা-কেনা করে। হনুমানজীর মন্দির গুলো অনেকটা বৌদ্ধ স্তূপের নকলে তৈরী। এ দেশবাসী লোকগুলিকে বেশ সরল-চিত্ত ব'লে মনে হয়। আমি ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন দ্বিতীয়বার অজন্তা যাই,—পথে, টাঙ্গাগাড়ীর ঘোড়া চব্বিশ মাইল ক্রমান্বয়ে চলে এসে একটা নদী পার হবার সময় অত্যন্ত অবাধ্য হয়ে উঠ্‌ল ;—কিছুতেই নদী পার হবে না। মহা বিপদ! এমন সময় ভাগ্যক্রমে সেই নদীতে একজন মহারাষ্ট্রীয় বৃদ্ধ স্নান কর্‌ছিলেন, তিনি আমাদের অবস্থা দেখে টাঙ্গাচালককে বল্লেন "ভাই আমার দুটো বড় বড় 'বয়েল' আন্‌চি—ঘোড়া খুলে ফেল, নদীর অপর পারে রাস্তার উপর তোমাদের গাড়ী উঠিয়ে দিচ্চি।" স্নান অসমাপ্ত রেখেই তৎক্ষণাৎ পুত্র সমভিব্যাহারে তিনি দুটো 'বয়েল' এনে উপস্থিত কর্‌লেন। তাঁদের অযাচিত উপকারে আমরা মুগ্ধ হলুম। বৃদ্ধ গাড়ীর চাকা ঠেলে, পুত্র 'বয়েল' চালিয়ে, সানন্দে আমাদের গাড়ী নদী পার করে, রাস্তায় তুলে দিলেন। আমি তাঁদের পারিশ্রমিক দিতে যাওয়ায় তাঁরা আমায় অপ্রস্তুত করে ফেল্লেন। বল্লেন "আরে রাম! রাম! আপনি কি জানেন না এ রকম উপকার জীবের জন্যে জীব না করলে জগৎপিতার কাছে দণ্ড পেতে হয়!"

পরিচয়

ষ্টেশন থেকে গুহার পথে আমাদের অশ্বচালিত টাঙ্গাগাড়ী যখন ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রান্তর পথে ছুটেচে, কতকগুলি হরিণও রাস্তার অপর পাশে আমাদের টাঙ্গাগাড়ীর আগে আগে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চল্লো ; যেন কে হারে কে জেতে—বাজির দৌড় ! বুনো পাখী গুলো সময় সময় পথের উপর গাড়ীর সাম্‌নে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে এসে বস্‌ত যে আমাদের ভয় হ'ত—এই বুঝি চাপা পড়ে।

ষ্টেশন থেকে বারো মাইল পথ অতিক্রান্ত হ'লে আমাদের নেরী ব'লে আর একটা নদী পার হ'তে হ'য়েছিল। নদীর ঠিক্ উপরে একটা বেশ বড় গ্রাম ; গ্রামটীর নামও নেরী। সেই গ্রামটি যেন ছবিটির মত সুন্দর ! নদীর ধারে দূরে সারি সারি মন্দির, মন্দিরের সাম্‌নে বাজার ; বাজারে বহু নরনারী, তাদের দেশের স্বাভাবিক নয়নতৃপ্তিকর বর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে বেচা-কেনা কর্‌চে। সেখানকার লোকেরা মহা-রাষ্ট্রীয়। রমণীদের বসন-ভূষণ আমাদের চক্ষে বেশ সভ্যভব্য ও আদর্শস্থানীয় বলে বোধ হ'ল। বিশেষ, পরিচ্ছদের বর্ণে এবং রচনা-পারিপাট্যে তাদের স্বাভাবিক শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। সেখানে কি দীন-দরিদ্র, কি ধনী, সকল রমণীদের দেহ কঞ্চুলিকাবৃত থাকে। একজাতীয় রমণী দেখলুম্ তাদের বেশভূষা বৈষ্ণবকবি-বর্ণিত ব্রজবাসিনীদের মত মনোরম। কাঁচুলী, ওড়না

ঘাগরাগুলি চিত্রে আরোপ-যোগ্য। তাদের বর্ণ গৌর, গঠন সুন্দর; প্রত্যেকের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, আর গায়ের জামাতে ছোট ছোট আয়না বসান। এই জাতীয় স্ত্রীলোক-দের সেখানে 'বাঞ্জারীণ' বলে। বাঞ্জারীণদের বেণী রচনা প্রণালী একটু বিচিত্র ধরণের। সিঁথী-করা চুল দুভাগে বিভক্ত।—কপালের উভয় পার্শ্বের কেশ ঈষৎ কপালের দিকে ফেলা, আর দুদিকে ঘুঙুরের মত দুটো গহনা ঝোলান। তা'তে তাদের ছোট্ট সুন্দর মুখগুলিকে আরও যেন শ্রীসম্পন্ন করে তুলেচে! মাথার উপর খোঁপাটি স্তম্ভের ন্যায় আকাশ পানে উঁচু করা আর সেটার উপর দিয়ে ওড়নার অবগুণ্ঠন পড়ায় অনেকটা বরক'নের টোপরের মত দেখায়। তাদের পরিচ্ছদের অনুরূপ পরিচ্ছদ অজন্তার ছবিতে কোন কোন জায়গায় দেখেচি। ১৭নং গুহায় বুদ্ধমূর্ত্তির সাম্‌নে মাতা ও পুত্রের ছবিতে অজন্তার শিল্পী যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করেচেন তার সঙ্গে অনেকটা মেলে। কিন্তু বাঞ্জারীণদের পোষাকের চেয়ে এগুলি কিছু উঁচু ধরণের। বাঞ্জারীণ রমণীদের যখন কল্‌সী মাথায় ঝর্‌ণার ধারে সারিবদ্ধ ভাবে গান গাইতে গাইতে জল আন্‌তে যেতে দেখতুম, তখন হঠাৎ বৈষ্ণব-কবিবর্ণিত বৃন্দাবনের কথা আমাদের মনে পড়্‌ত।—শুধু যেন গোপীমোহনের বেণু বাদনেরই অভাব!

সেখানকার গ্রামের একটা আশ্চর্য্য ভাব এই যে,

পরিচয়

হঠাৎ দেখলে মনে হয় জনহীন পোড়ো গাঁ ! আসলে তাদের ঘরের ছাদ আমাদের দেশের মত খড়ে ছাওয়া নয়,—মাটীর ছাদ। তাই, তাদের মাটীর ঘরগুলি আমদের পরিত্যক্ত কুটীরের প্রাচীরের মত দেখায়। তাদের পুরানো ঘরগুলির ছাদে, পাঁচিলের উপর ধারে ধারে একরকম সরু লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায়; তাতেই লোকালয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমরা—অর্থাৎ আমি, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, Mrs. Herringham প্রভৃতি সকলে অজন্তাগুহার সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী যে গ্রামটীতে ছিলুম, তার নাম 'ফর্‌দাপুর'। বোধ হয় গ্রামটীর পূর্ব্বে অন্য কোন নাম ছিল, পরে কোন মুসলমান রাজা গ্রামটিকে এই নামে অভিহিত ক'রে থাকবেন; অথবা মুসলমানদের আমলে স্থাপিত এটি একটি নতুন গ্রাম। সেখানে প্রধান দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন (আরঙ্গজীবের আমলের) বাদ্‌শাহী সরাই। পান্থনিবাসটি একটা চক-মেলান ঘরের শ্রেণী; মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চৌকো মাঠ বিস্তৃত। প্রকোষ্ঠগুলি এই প্রাঙ্গণটিকে ঘিরেই সারি সারিভাবে তৈরী। চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণটির মধ্যে একটি মস্‌জিদ্। সরাইএর উত্তর ও দক্ষিণে দুটি তোরণদ্বার দুর্গদ্বারের মত বড়। এই দ্বার দুটির দুপাশে ছাদে ওঠবার দুটি সিঁড়ি।—ছাদের উপরে চারকোণে চার্‌টে উঁচু মান-মন্দির; সেখান থেকে নীচের ও দূরের দৃশ্য বড়

সুন্দর ও স্পষ্ট দেখায়! ফর্‌দাপুর গ্রাম থেকে আট মাইল দূরে ইন্দ্ধয়াদ্রির উপর অজন্তা নামধেয় একটী প্রাচীন সহর অত্যাপি বিত্তমান আছে। ফর্‌দাপুর গ্রাম থেকে সেখানে যাবার বাদশাহী পথ বহুপূর্ব্ব হ'তেই আছে। শোনা যায়, আওরাঙ্গজীব বাদশাহ সসৈন্যে ঐ পথ দিয়ে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে গিয়েছিলেন, পথে মধ্যে মধ্যে দুএকটা বাদ্‌শাহী প্রবেশদ্বারের জীর্ণ কঙ্কাল এখনও বর্ত্তমান। সেখানে ফর্‌দাপুরের মত একটা সুবৃহৎ সরাইও আছে। সে সরাইটি ফর্‌দাপুরের সরাই অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ! সেটি সমবাহু অষ্টভুজাকৃতি। সারিবন্ধ প্রকোষ্ঠগুলি একএকটি অষ্টকোণ প্রাঙ্গণক্ষেত্রের সীমা-রেখা। প্রবেশদ্বার দুটি। অজন্তাগুহা, অজন্তাগ্রাম, ফর্‌দাপুর প্রভৃতি স্থান নিজামরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জালগাঁও ষ্টেশন থেকে ফর্‌দাপুরে যাবার পথে পূর্ব্বে যে একটী (নেরী) গ্রামের উল্লেখ করেছিলুম সেই গ্রামের নদী পার হ'লে ফর্‌দাপুরের দিক্‌টা নিজামের আর জালগাঁও ষ্টেশন প্রভৃতি নেরীর দিকের গ্রামগুলি বম্বে গভর্ণমেণ্টের অধীনে। অজন্তা গ্রামই (পূর্ব্ব-খান্দেশের) নিজামরাজের 'সদর' বা সহর। সেখানকার সদাশয় তশিলদার সাহেব (Magistrate) আমাদের ওখানকার হাটবাজার, কাছারী, জেলখানা প্রভৃতি যেখানে যা দেখ্‌বার ছিল দেখিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। এই

সব দেশের গ্রামের বা সহরের পথগুলি সঙ্কীর্ণ বা গলি-ঘুঁজি নয় ;—রাস্তাগুলি একএকটী প্রান্তর বল্লেও চলে। দশ বারটা হাতী পাশাপাশি একসঙ্গে অনায়াসে চ'লে যেতে পারে। আমরা তশিলদার সাহেবের কাছারীবাড়ী দেখবার সময় বাড়ীটার পিছনে যে একটা স্বভাবের সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে শোভা আমরা কাছারীবাড়ী প্রবেশের সময় বা কাছারীর সাম্‌নে অবস্থানকালে কল্পনাও কর্‌তে পারিনি !—প্রথমে আমরা কাছারীবাড়ীর এজ্‌লাস-ঘর ও অন্যান্য ঘর দেখে হাকিমের বিশ্রামাগারে প্রবেশ কর্‌লুম। বস্তুতঃ, এটি একটি দস্তুর-মত শয়নকক্ষ। আমরা যেমন আমাদের ঘরের যেখানে-সেখানে একটা খাট বা কিছু বিছিয়ে শয়ন করি, এ তা নয় ; শোবার ঘরটির একটু বিশেষত্ব আছে। শোবার ঘরের প্রবেশ-দ্বারের ঠিক্ সাম্‌নে 'দরী' বিছান ; আর তারই পশ্চাতে দেয়ালের মধ্যে পরদা টাঙান একটি বিশেষ শয্যাপ্রকোষ্ঠ। পালঙ্কটি তারই ভিতরে স্থাপিত, অর্থাৎ, ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের নয়নতৃপ্তির জন্যে সাজান শয়নকক্ষের দৃশ্য ! শয়নগৃহ থেকে যখন আমরা পশ্চাতে বাইরের বারান্দায় এসে পড়্‌লুম তখন, একটা পাঁচিলঘেরা উঠান ও ইঁদারা কিম্বা খুব বেশী সুন্দর জিনিষের যদি আমরা আশা কর্‌তুম ত হয়ত একটা ফুলের বাগিচা ! কিন্তু এসবের পরিবর্ত্তে

আমরা মোগলস্থপতিবিজ্ঞান-অনুমোদিত সুগোল থামের উপর গোল খিলেন দেওয়া বারান্দার উন্মুক্তপথে যেন ঠিক একখানি ফ্রেমের মধ্যে কোন দেবশিল্পীর অঙ্কিত একটি মনোহর চিত্রের সাম্‌নে এসে পড়লুম। হঠাৎ যেন রঙ্গমঞ্চের শয়ন কক্ষের দৃশ্য, যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে আবার এক অভিনব দৃশ্য প্রকাশিত হ'ল। ধূর্জ্জটির মত ধূসর ও উদার-গম্ভীর অচলমূর্ত্তি,—আর তার মাথা বেয়ে একটি ক্ষীণ রজত-জলধারা ধূর্জ্জটির জটানিঃসৃত সুরধুনীর মত ঝর্ ঝর্ শব্দে অতল-তলে ঝ'রে পড়্‌চে! আশেপাশে হরিণ-হরিণীরা শান্তিতে বিচরণ কর্‌চে! আমরা সেই দৃশ্যটি ভালরূপে দেখবার জন্যে একবার কাছারী বাড়ীর ছাদে উঠ্‌লুম। যতই দেখি—যেন আশ আর মেটে না! আমরা সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আশ্চর্য্য সুন্দর দৃশ্য দেখে শুধু অবাক হ'য়ে রইলুম!

পর্ব্বতশিখর থেকে নীচের পার্ব্বত্য তরঙ্গায়িত পরিসর-ভূমিসকল হঠাৎ বহুদূরের কুহেলি-আচ্ছাদিত তরঙ্গায়িত পারাবারের মত দেখায়। মনে হয়, যেন আমরা সমুদ্রতীরে শৈলশিখরে দাঁড়িয়ে!—এ যেন এক ঐন্দ্রজালিকের কাণ্ড!

ষ্টেশন থেকে ফর্‌দাপুরের পথ বেশ ভাল; কিন্তু, ফর্‌দাপুর থেকে প্রত্যহ যে তিন মাইল ইন্ধয়াদ্রির পথে গুহাভিমুখে আমাদের যেতে হ'ত, সেই গুহা যাবার

পরিচয়

পথটি অত্যন্ত বন্ধুর। পথ এত জঘন্য যে, কখন কখন আমাদের গো-শকটের চাকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের উপর একবার উঠে, একবার পড়ে, আমাদের যেন "হেঁটেল বনদিয়ে হ্যাঁচ্ড়াতে হ্যাঁচ্ড়াতে" কোনগতিকে গুহায় নিয়ে যে'ত! সেখানকার গরু ধন্য—গো-যান ধন্য! আশ্চর্য্য এই, এরকম কদর্য্য পথেও বয়েলগুলো প্রত্যহ দুবেলা অতি সহজে গাড়ী বহন কর্‌ত! আমরাও প্রকৃতপ্রস্তাবে পথ কদর্য্য বা দুর্গম হ'লেও তা'তে আমোদ ছাড়া অশান্তি বোধ কর্‌তুম না।

অজন্তার পথে পাহাড়ের গায়ে ছায়াপ্রধান বনস্পতি না থাক্‌লেও, মঞ্জুল শেফালিকুঞ্জে তার অঙ্গ ভরা! স্থানে স্থানে ঠিক সোণার বরণ পদ্মের মত ফুলে ভরা গাছ! পর্ব্বতের কোন কোন জায়গা প্রাচীরের মত খাড়া ও এত মসৃণ যে তৃণ পর্য্যন্তও জন্মাতে পায়নি! এই সব স্থানের পর্ব্বতগুলো একএকটি আস্ত পাথরের স্তূপ; অর্থাৎ পাহাড়টির ভিতর ফাঁপা বা মাটীভরা নয়। গুহা-গুলি সব এইরকম একটা পাহাড়েই খোদাই করা।

আমরা ফর্‌দাপুর গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রত্যহ সমতল প্রদেশ অতিক্রম ক'রে যতই গুহায় যাবার পার্ব্বত্য পথে এসে পড়তুম, দূরের পাহাড়গুলো যেন সরে সরে আমাদের কাছে ততই এগিয়ে আস্‌ত! ক্রমে যতই গুহার নিকট-বর্ত্তী হ'তুম ততই দুপাশ থেকে গিরিপ্রাচীর গগনতল

ভেদ ক'রে যেন বেশী ঘনবদ্ধ হ'য়ে এসে কারাপ্রাচীরের মত আমাদের ঘিরে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। পথটি সর্পাকারে কখন পাহাড়ের উপরে উঠে, কখন নেবে, কখন বেঁকে, কখন বা সোজাভাবে বিচিত্রগতিতে গুহার দিকে চলে গেছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের সমতল পথে চলা অভ্যাস, তাই সেখানকার সেই বিচিত্র বক্রগতিতে আমাদের বেশ কৌতুক জন্মাত।

অজন্তাপাহাড়ের নির্জ্জনপ্রদেশ হ'তে বিনিঃসৃত একটি সুনির্ম্মল স্বচ্ছ জলধারা পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিভিন্নগতিতে এঁকে বেঁকে সমুদ্রের দিকে ব'য়ে গেছে। আমাদের প্রত্যহ গুহায় যাবার সময় সেটিকে চার পাঁচ বার অতিক্রম কর্‌তে হ'ত। আমরা যখন সেখানে ছিলুম তখন শীতকাল; কাজেই শীতকালে জল কম থাকে ব'লে আমাদের গাড়ী সহজেই নদীবক্ষ পার হ'য়ে যেত। নদীর ধারে—কোথাও বা পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে সুগোল পাথরের, কিম্বা শুভ্রোজ্জ্বল স্ফটিকের টুক্‌রো একত্র হ'য়ে শিলাবৃষ্টির শিলগুলির মত ইতস্ততঃ ছড়ান আছে—দেখলে মনে হয়, যেন কারো খেয়ালের কাজ!

পাহাড়ের উপর আলো-ছায়ার মিলন একটা দেখবার জিনিষ! পর্ব্বতশিখরের স্থানে স্থানে শীত-শুষ্ক সোণালী তৃণের উপর অরুণ আভা—উজ্জ্বল রতন কিরীটের মত গিরিশিরে শোভা পেত। আবার কখন কখন গিরির ধূসর শীর্ষদেশে

মেঘের ছায়া-সম্পাতে মহেশের ঘন-পিঙ্গল জটার মত দেখাত। সত্য সত্যই সেই নিভৃত-রাজ্যের তাপস সেই অচলরাজ!

গুহাগুলি পর্ব্বতের এমন একটি নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত, সেখানকার দৃশ্যটি এমন চমৎকার ও মনমুগ্ধকর যে, সেখানে গেলে আমাদের মুখ দিয়ে কথা সর্‌ত না—আমারা নির্ব্বাক হয়ে যেতুম! ধাতা যেন সেই নির্জ্জন স্থানটিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তপস্যার জন্যে বিশেষভাবে পাহাড়পর্ব্বত নদনদী দিয়ে দুর্গেরমত প্রাচীর-পরিখায় গড়বন্দী ক'রে রেখেচেন। আমাদের এই জগৎ-প্রসিদ্ধ সুসভ্য কল্‌কাতা সহরের ক্ষণভঙ্গুর ইটের চার পাঁচ-তলা হর্ম্ম্য দেখে যাঁরা মুগ্ধ হন, তাঁরা যদি এই রকম স্বাভাবিক দৃশ্যসৌন্দর্য্যের রমণীয়তার মধ্যে এরূপ পর্ব্বত-পঞ্জর-খোদিত শৈল-হর্ম্ম্যশোভা সন্দর্শন করেন, তবে নিশ্চয়ই বিমোহিত হ'য়ে যাবেন! বস্তুতঃ সেখানে গেলে কি ভাবের উদয় হয় তা প্রত্যক্ষকালে নিজে যতটুকুও অনুভব কর্‌তে পেরেছিলুম এখন তার কণামাত্রও অক্ষরে প্রকাশ কর্‌তে অক্ষম! প্রথমেই যখন আমাদের বহুদূরের সারি সারি বিহারগুহাগৃহের বারান্দাগুলির থাম আর গোল গোল সুবৃহৎ চৈত্যগুহার খিলানের আকৃতি চোখে পড়্‌ল, তখন, বিস্ময়ের আর অবধি রইল না!

গুহাগুলি পাহাড়ের গায়ে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়

খোদা। গুহাগুলির একেবারে ধারে কোন পথ নেই ! গুহায় যেতে হ'লে গুহার সাম্‌না-সাম্‌নি একটা জায়গায় গাড়ী থেকে নাম্‌তে হয়। সেখানে দাঁড়ালে দূরে পাহাড়ের মাঝে সারি সারি গুহাগুলি ছোট ছোট পায়রার খোপের মত দেখায়। সেখান থেকে পাহাড়ের ঝরণায় তৈরী নদীর বক্ষ দিয়ে গুহা পর্য্যন্ত দশ পনের মিনিটের পথ হেঁটে যেতে হয়। বর্ষায় যখন নদীটি জলে ভরে ওঠে তখন সেখানে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। গুহাগুলির মুখ সব প্রবাহের দিকে। সেখানে স্রোতস্বতী দুপাশের গিরিপদমূল ধৌত ক'রে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে যেখানে নদীর দুপাশের পাহাড় দুটি একত্র এসে মিলেচে, সেই নিভৃত অচল-কোণের সীমা বেয়ে ঝরে পড়্‌চে ! গুহার দিকে মুখ ক'রে সেই প্রবাহের উপর দাঁড়ালে মাথার উপর সুনীল গগন, পদ-নিম্নে নির্ঝরিণীর কল-মধুর গান, আর চারি পাশে অত্যুচ্চ শৈল-প্রাচীর-ঘেরা বন-তল ; তারই এক দিকে আমাদের অটুট অসীম প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ সারি সারি সুচারু গুহাগুলি দেখ্‌লে যেন প্রাণ জুড়ায় ও জাতীয়-গরিমায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠে ! জলপ্রপাতটি তার বিমল জলরাশি অবিরলধারে ঢেলে আনন্দে কলগান গেয়ে অনন্তকাল ধ'রে ভারত-শিল্পের মহিমা কীর্ত্তন করচে !

অজন্তাগুহার মূর্ত্তিগুলির সম্বন্ধে সেদেশের লোকের মতামত অদ্ভুত। ফেব্রুয়ারী মাসে অজন্তায় একটা মেলা

অজন্তার বহির্দৃশ্য

হয়, মহারাষ্ট্রীয় অসংখ্য নরনারী তাদের বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে সেখানে আসে। দোকান-পসার ঝরণার ধারে ব'সে। সেখানকার লোকেরা গুহাগৃহ গুলির ভিতরের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিকে শ্রীরামচন্দ্র বা লছমনজী প্রভৃতি নানান নামে অভিহিত ক'রে থাকে। পাণ্ডারা সেই সব মূর্ত্তিকে নানান সাজে সাজিয়ে সিঁদূর লেপে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে বেশ আয়ের উপায় ক'রে থাকেন। ২৬ নং গুহায় যে প্রকাণ্ড বুদ্ধদেবের মহা-পরিনির্ব্বাণের মূর্ত্তি আছে সেটিকে তারা সীতা দেবীর মৃতা জননী বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

সে দেশের লোকে গুহাগুলিকে মানুষের তৈরী বলে মনে করে না। বাঙ্গলা দেশে ছেলেবেলায় 'দুর্গেশ-নন্দিনীর' গড়মান্দারণের ভগ্নাবশেষের কাছে একটি বহু পুরাতন দীর্ঘিকা সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলুম যে, দৈত্যেরা সেটি রাতারাতি খুঁড়ে ফেলেছিল। এই গিরিগুহা সম্বন্ধে প্রবাদটিও সেইরূপ। কোন স্মরণাতীত যুগে ভগবান বিষ্ণু, ইন্দ্ধয়াদ্রির নিভৃত বক্ষপঞ্জর খুদে গুহাগুলি গঠিত করে সুষুপ্ত রজনীযোগে স্বর্গধামে নিয়ে যাবেন স্থির করলেন। বিষ্ণুর আদেশ-মত বিশ্বকর্ম্মা গুহানির্ম্মাণ কাজে নিযুক্ত হলেন। পরে দৈবক্রমে গুহাগুলি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'তে-না-হ'তেই প্রভাত দেখা দেবার উপক্রম হল। পর্ব্বতের প্রান্তভাগে ধূম্র আঁধারের

পাশে ঈষৎ রক্ত আভা ফুটে উঠ্‌ল। জীবের সুপ্তি-ভঙ্গের সময় উপস্থিত দেখে বিষ্ণু তাঁর বাহন গরুড়কে গিরিপ্রাসাদগুলি অতি সত্বর স্বর্গে নিয়ে যেতে আদেশ কর্‌লেন। ভগবৎ-আজ্ঞায় গরুড় ত্বরান্বিত হ'য়ে অসমাপ্ত গুহাগুলি সমেত গিরিবরকে তাঁর পক্ষপুটেবহন করে নিয়ে যেই গগনমার্গে উঠ্‌বেন, অম্‌নি কুক্কুটবৃন্দ প্রভাতআগমনী সংবাদ ঘোষণা করায় পক্ষিরাজ গুহাগুলি যথাস্থানে পরিত্যাগ ক'রে সত্বর লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে যেতে বাধ্য হলেন।
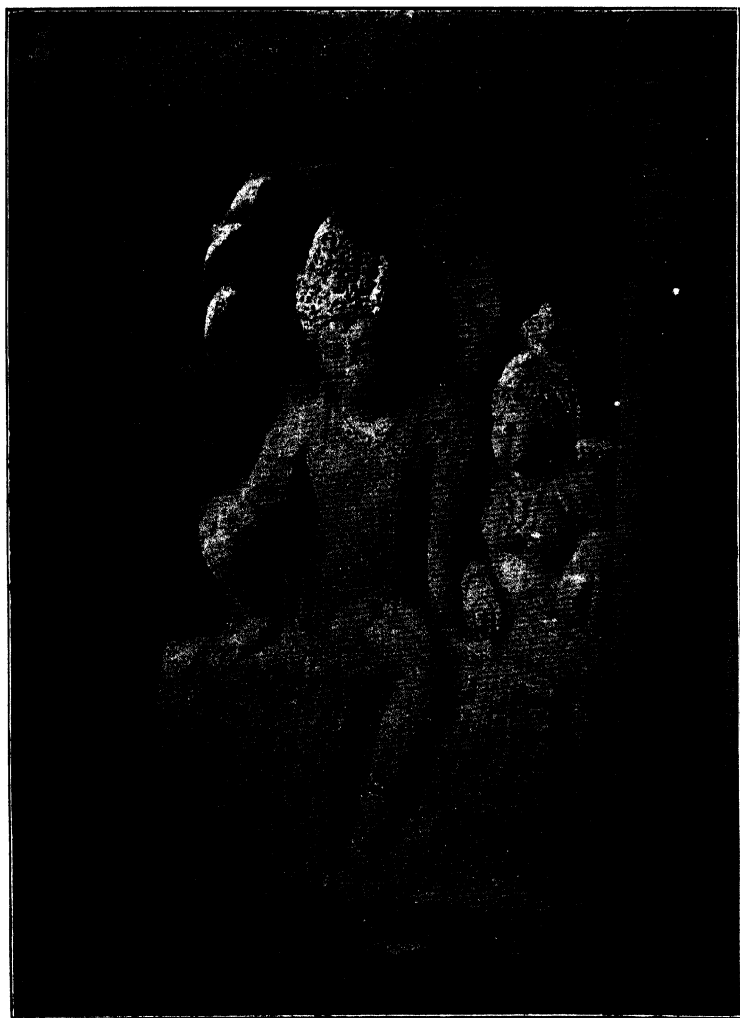
নাগেশমূর্ত্তি

ভিক্ষার্থী বুদ্ধের সম্মুখে মাতা ও পুত্রের
খোদিত মূর্তি

চিত্র

চিত্র

ভারতীয় চিত্রের আদর্শ আমরা পাই, প্রথমত বৌদ্ধ-গুহা থেকে, দ্বিতীয়ত—মোগলরাজাদের প্রাসাদ এবং পুস্তকাদিতে অঙ্কিত চিত্র থেকে।

মোগল ও অজন্তার শিল্প কতকটা একই নিয়মে রচিত। পাশ্চাত্য-শিল্পের মত ওগুলি শুধু আলো ও ছায়ার খেলা দেখিয়ে পালাতে চায় না; ওরা ভাব ফুটিয়ে তোলবারই কেবল চেষ্টা করে। যাঁদের ধারণা, স্বভাবের হুবহু নকল করার নাম, অথবা কাগজে থিয়েটারের ছবি দেখানর নামই চিত্র-শিল্প, তাঁরা যদি অজন্তাগুহায় পদার্পণ করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁদের সে ভুল বিশ্বাস দূর হবে। একদিকে তাঁরা সেই বিরাট চিত্র-ভাণ্ডারে অতুল ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্মিত হয়ে যাবেন, অন্যদিকে আমাদের দেশে শত-সহস্র বৎসর আগে এইরকম সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছিল বলে—আত্মগৌরবে অভিভূত হয়ে পড়্বেন।

অজন্তার শিল্পীরা যে সমস্ত পরিকল্পিত চিত্রে গিরি-গুহা পরিশোভিত করে রেখে গেছেন, সে সমস্তগুলির শুধু নকল কর্তে পারাও বিশেষ দক্ষতার কাজ। এমন কি আমরা শুনেছি বিলাতের সুনিপুণ শিল্পীরাও সুন্দররূপে তার দুএকটা ছবিরও সামান্য প্রতিলিপি

করে উঠ্‌তে পারেন নি। বিশেষত ছবির যেটি প্রাণ, অর্থাৎ ছবির আসল ভাবটি একেবারেই বজায় রাখ্‌তে পারেননি। মোগলশিল্পও পাশ্চাত্য চিত্রকরগণের কাছে এক আশ্চর্য্য ব্যপার! একটা নখের মত স্থানের মধ্যে সংখ্যাতীত কারু-শিল্প যে কি করে দেখান যায়, তা তাঁরা বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। সূক্ষ্ম কারু-শিল্প-বিষয়ে মোগল শিল্প শ্রেষ্ঠ; আর বৌদ্ধ শিল্প ভাব-পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রধান।

আমরা যখন গিরি-গুহায় প্রবেশ ক'রে সর্ব্বপ্রথম সেই অনন্ত অসংখ্য কারু-শিল্প দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল, এই সকল কাজ না জানি কত যুগ ধরে কতশত শিল্পী মিলে এঁকেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যতই সেগুলি দেখ্‌তে লাগলুম ততই আমাদের মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই বিচিত্র কারুশিল্পসমূহ শিল্পী-গণের অন্তর হতে অবলীলাক্রমে যেন নির্ঝরের মত প্রবাহিত। সেগুলি তখন দেখ্‌লে আর মনেই হত না যে, সে সব অনেক মাথা ঘামিয়ে বা বহু পরিশ্রমে আঁকা! যেন আলাদিনের প্রদীপের গল্পের মত সে এক বিচিত্র ব্যাপার! অজন্তার এই অতুলনীয় শিল্প-সৌকার্য্য দেখে Mr. Griffiths মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর The paintings in the Budhist Cave Temples in Ajanta নামক পুস্তকে উচ্ছ্বাস-ভরে বলেছেন—

"যে চিত্রকরেরা এই সকল অঙ্কন করেছিলেন তাঁরা অঙ্কন কার্য্যে অমানুষিক প্রতিভাশালী! এমন কি সোজা দেওয়ালের গায়েই তুলির এক আঁচড়ে যে সকল রেখা আঁকা হ'য়েছে তা আমার কাছে অতি আশ্চর্য্যজনক ব'লে বোধ হ'ল। কিন্তু উপরে ছাদের গায়ে ঠিক তারই মত অকুণ্ঠ-হাতের অবলীলভাবে আঁকা সুদীর্ঘ সূক্ষ্ম রেখাবলী যখন দেখ্লুম তখন, আমার কাছে তা ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ল না! আমাদের একজন ছাত্র ভারা-বেঁধে ছাদের গায়ের ছবি যখন প্রথম নকল কর্ছিলেন তখন তিনি বল্লেন যে, এর ভিতর কতকগুলি কাজ যেন ছেলেমানুষের হাতের বলে বোধ হয়। কিন্তু একটু ভাব্লে বোঝা যায় যে, উপরের যে-ছবিগুলি তাঁর কাছে অর্থহীন ব'লে বোধ হচ্ছিল সেগুলি এমন দক্ষ-তার সহিত আঁকা যে, যখন নীচে—ঠিক্ যায়গা থেকে দেখা যায় তখন তার প্রত্যেক রেখাটি সুবিন্যস্ত ভাবেই চোখে পড়ে।"

এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যালোক যখন গুহাগুলি আলোকিত কর্ত তখন, গুহার দেয়ালের ছবিগুলি আলোতে যেন প্রাণ পেয়ে সজীব হ'য়ে উঠে আমাদের চোখে সে যে কি বিস্ময়পূর্ণ সৌন্দর্য্যের অবতারণা কর্ত তা বলা অসম্ভব! সে ব্যাপার যিনি প্রত্যক্ষ করেচেন, তিনিই কেবল বুঝ্তে পারবেন।

সংকীর্ত্তন।

১৭ নম্বর গুহার সিংহল-বিজয়ের চিত্র হইতে।

দেয়ালের কোথাও রাজারাণী পারিষদ্‌বর্গে বেষ্টিত হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে, কোথাও রাজ্যাভিষেক—বাহিরে ভিখারী বিদায় হ'চ্চে, কোথাও গান বাজনা—বেণু-বীণা বাজিয়ে নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা আসর জমিয়ে তুলেচে; কোথাও বা রাস্তায় রাস্তায় ঢোল মৃদঙ্গ নিয়ে সংকীর্ত্তন বেরিয়েছে, এই রকম আরও শত শত চিত্র এক সঙ্গে চোখের উপর ফুটে উঠে আমাদের যেন কোন্ এক নূতন অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যেত! প্রথম প্রথম আমরা কোন্‌টা ছেড়ে যে কোন্‌টা দেখ্‌বো তা ভেবেই ঠিক্ করতে পারতুম না। মনে হত যেন কি এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে এসে আত্মহারা হয়ে পড়েচি! ভারতের পরবর্ত্তী সময়ের মোগল চিত্র দেখে এরকম ভাব আমাদের কখনও হয়নি। মোগল চিত্র চোখের সাম্‌নে ধরে তার মধ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের বিচার ক'রে তবে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। মোগলচিত্রে আমরা প্রধানত বিলাস ও ক্রীড়ার ভাবই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রেই একটা আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তির ভাবে মণ্ডিত! এমন কি যুদ্ধ বিদ্রোহের ছবিতে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব প্রবেশ করেছে। তা'হলে বুঝ্‌তে হবে মোগল-শিল্প বিলাসপ্রধান এবং বৌদ্ধ শিল্প শান্তিময়।

মোগলদের চিত্ররচনা-প্রণালী ও বৌদ্ধ শিল্পিদের চিত্ররচনা-প্রণালীর মধ্যে একটা বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য

আছে। মোগল শিল্পীরা চিত্রের যে ভাব অতি চেষ্টা ও যত্নে সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন, বৌদ্ধশিল্পীরা সেটা দুচারটে সরু-মোটা রেখার টানে অল্পায়াসে দেখিয়ে দিয়েছেন। চিত্রশিল্পীদের এরূপ রেখাঙ্কনের দক্ষতা মোগল কেন পৃথিবীর কোন দেশের শিল্পীদের ছিল কিনা সন্দেহ।

অজন্তাচিত্র বর্ণসমাবেশেও অতি মনোরম! তার প্রতিবর্ণ চোখে স্নিগ্ধ শীতল ভাব আনে। মোগল কিম্বা অন্য কোন শিল্পে সেরকমটা প্রায় দেখা যায় না! বৌদ্ধ আর মোগল চিত্র উভয়েরই রঙের একটা প্রধান গুণ, শত শত বৎসরের পুরাতন মোগল ছবি এবং সহস্র বৎসরের জীর্ণ বৌদ্ধ ছবিগুলির কোনোটিরই বর্ণের অদ্যাপি কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সেগুলি যেন চির-নবীন! অজন্তার ছবি দেখলে হঠাৎ মনে হয়, এইমাত্র বুঝি কেউ রং দিয়ে গেল! স্বভাবত পরিবর্ত্তনশীল রঙের মধ্যে সাদা আর নীল রংগুলি অজন্তার ছবিতে এখনও এত পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান যে, ইংরাজ দর্শকেরা স্বীকার করতেই চান্ না যে, সে সব রং সহস্র বৎসরের পুরাতন! তাঁরা বলেন, পরবর্ত্তী চিত্রকরেরা সংস্কারের সময় ওগুলিতে নূতন করে রং দিয়েছিলেন। যাই হ'ক্, ভারতীয় চিত্রের রং যে ইউরোপীয় তৈলচিত্রের চেয়ে স্থায়িত্বে শ্রেষ্ঠ সেকথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বৌদ্ধ শিল্পীদের অসীম ধৈর্য্য দেখ্‌লেও স্তম্ভিত হতে

করকমল
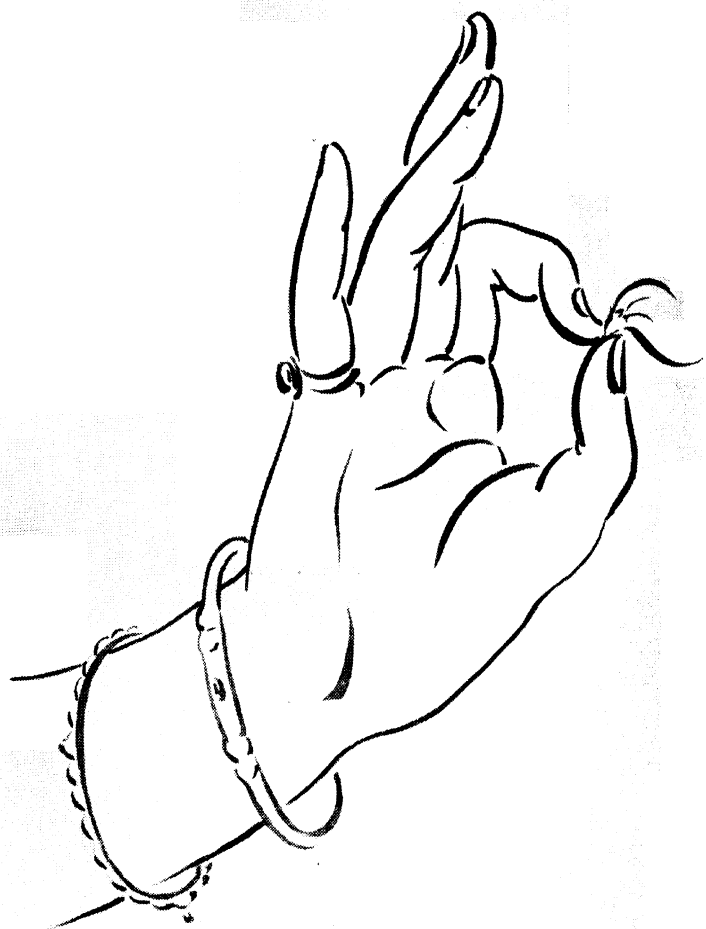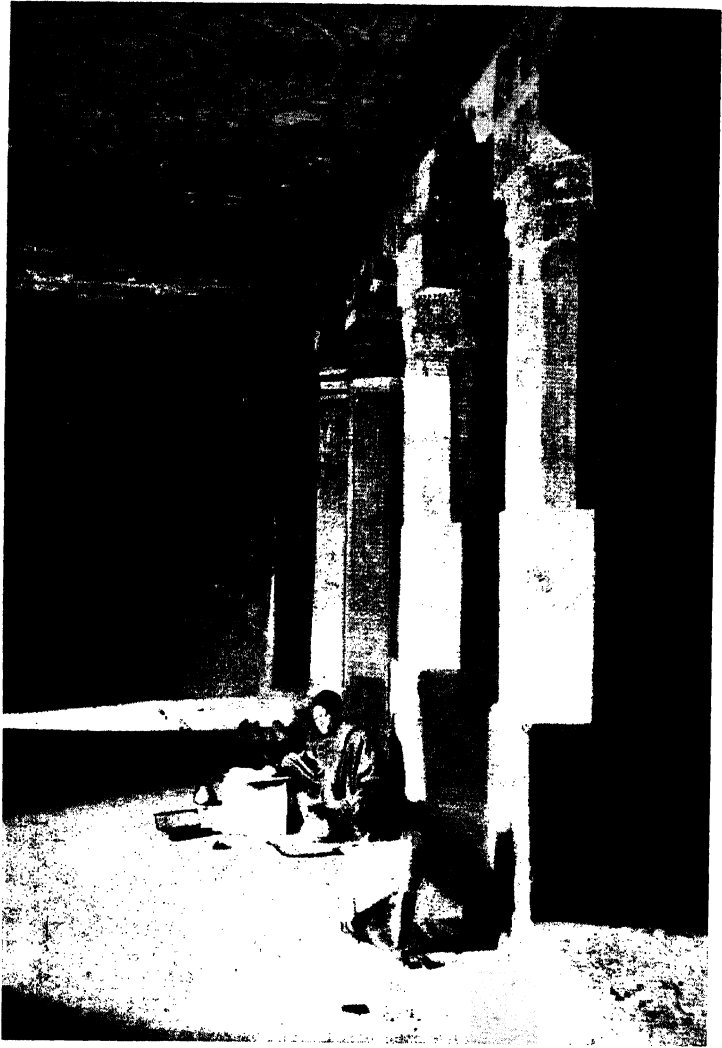
ছাদের নীচের কারুকার্য্য

হয় ! সেই অবরুদ্ধ অন্ধকার গুহার ভিতর নানান অসুবিধার মধ্যে, বিশেষত ছাদের নীচে যে কি করে তাঁরা ঐ সমস্ত বিস্ময়কর ও নয়নানন্দ কারুকার্য্য রচনা করে গেছেন, এখন তা বোঝাই অসাধ্য। এ বিষয়ে মোগল চিত্রকর অথবা অন্য কোন দেশের চিত্রকরকেই এতটা কষ্ট স্বীকার করতে দেখা যায় না।

আলঙ্কারিক শিল্প (decorative art) সম্বন্ধে বৌদ্ধ-শিল্পী এবং মোগলশিল্পীরা প্রায় সমকক্ষ। অজন্তা গুহার শীর্ষদেশের সজ্জা (ceiling decoration) এক বিচিত্রকাণ্ড ! হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয়, যেন মাথার উপর একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙান রয়েছে ! প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা ক'রে প্রকাণ্ড শ্বেত-পদ্ম বিকশিত ; আর তার চারিধারে গোলভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস, কিম্বা ময়ূর, অথবা মৃণাল-দল-মন্থন-তৎপর হাতীর পাল ; এবং চার কোণে নানারকম লতা-পাতার কাজ। সেগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখলেই বোঝা যায়। মোগল আলঙ্কারিক চিত্র সূক্ষ্মতা হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে ; কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় না।

অজন্তাগুহায় গাছপালার চিত্রগুলিও প্রায় নিখুঁত। মোগলচিত্রেও বৃক্ষাদির ছবি অতি সুন্দর ! পাশ্চাত্য শিল্পীদের মত তাঁরা শুধু তুলির স্পর্শে একটা গাছের ভঙ্গি

খাড়া করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন না ; তাঁরা যতদূর সম্ভব গাছের পাতাগুলি এমন কি গুঁড়ির আকারের তারতম্য ঠিকভাবে এঁকে তার পরিচয় দিয়ে দেন ; অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় চিত্রের গাছপালা দেখ্‌লে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না যে, 'এটা কী গাছ ?'

পারিপ্রেক্ষিকের (perspective) খুঁটিনাটির উপর তীক্ষ্ণ নজর না দিলেও অজন্তার ছবিগুলি দেখ্‌লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিল্পীরা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। আমরা ১ নম্বর গুহার দেয়ালের এক জায়গায় একটা ছবির নকল নেবার সময় হঠাৎ পিছন ফির্‌তেই দেখ্‌লুম, গুহার চারিদিকের বারান্দা-দেওয়া প্রকাণ্ড 'হল'-ঘরটা যেমন, চিত্রকরেরা যেন ঠিক সেইটে দেখেই একটা বারান্দা-দেওয়া 'হলের' ছবি এঁকেছেন। এতে বোধ হয় যে, তখন পারিপ্রেক্ষিক বলে একটা কিছু বিশেষ কথা না থাক্‌লেও তাঁরা ও বিষয়ে নেহাৎ অজ্ঞ ছিলেন না। তবে তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পীদের মত ঐটেকেই ছবির সার বা চূড়ান্ত জিনিস বলে মান্‌তেন না। অজন্তার ছবি ছায়া-আলোক (shade and light) সমাবেশেও নয়ন-তৃপ্তিকর। ইউরোপীয় ছবিতে যেমন ছবির একদিকে খুব আলো আর অপর দিকে আঁধার ঘনিয়ে দিয়ে ছবির কোমলত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া হয়, এ তা নয়। অজন্তার ছবিতে গঠন দেখাবার জন্যে কোন

কোন জায়গায় সামান্য, কোন কোন জায়গায় প্রচুর shade দেওয়া আছে।—তাতে ছবিতে ভারি চমৎকার একটা স্নিগ্ধ ও স্বাভাবিক ভাব এসে পড়েচে।

অজন্তার চিত্রে আমরা অস্থি-সংস্থানের (Anatomy) ভুল কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। Mrs. Herringham বল্‌তেন, "এত প্রাচীন কালে আঁকা তোমাদের দেশে এরকম নিখুঁত ছবি দেখলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। আমাদের দেশে এ রকম ছবি থাক্‌লে আমরা তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশী যত্ন কর্‌তুম! বড়ই দুঃখের বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তুর আদর জান না।"

অজন্তার ছবিতে আমরা যে সমস্ত নানা রকমের নিখুঁত ভাবে আঁকা জীবজন্তু, পশু, পক্ষী, গাছ-পালা, প্রাসাদ, প্রাচীর, দোকান, কুটীর প্রভৃতির চিত্র দেখ্‌তে পাই, সে সমস্ত কোন আদর্শকে সম্মুখে রেখে তার অনুকরণ না করে কেবল কল্পনার দ্বারা যে কিরূপে ফুটিয়ে তুলেচেন তা আমাদের জ্ঞানাতীত! তাঁরা তাঁদের চিত্রের দু এক জায়গায় যে সমস্ত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করেছেন, সে গুলির স্থানে স্থানে রং উঠে যাওয়ায়, তা অল্প অল্প প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেগুলি দেখে বেশ স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁদের যা-কিছু যখন মাথায় আস্‌ত অমনি গোবরমাটি-লেপা দেয়ালে সাদা রঙের একটা জমি তৈরী করে এক এক তুলির টানে তা এঁকে

যেতেন ; তার পরে তাঁদের ইচ্ছামত তার উপর রং দিয়ে ঢেকে সংশোধন কিম্বা পরিবর্ত্তন কর্‌তেন। আজকালকার মত পেন্‌সিলের দাগ বারবার রবারে ঘসে ঘসে ইচ্ছামত অতি সহজে বদল করতে কিম্বা শোধ্‌রাতে পার্‌তেন না। এ বিষয়ে তৈল-চিত্রে অনেক সুবিধা ; কেন না, নরম মাটিতে পুতুল গড়ার মত একটা ছবির উপর অবলীলা-ক্রমে যেমন ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করা চলে। অজন্তার শিল্পীরা ছবিতে সংশোধন করা সুকঠিন জেনে, যে বিষয়টা আঁকৃতেন যথাসম্ভব তার রূপ ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন মানসচক্ষে সাদা দেয়ালের উপর ছবিটা ফুটে উঠেছে দেখ্‌তেন তখন তুলিতে হাত দিতেন ! অন্য দেশের খুব অল্প শিল্পীই ওরকম পদ্ধতিতে ছবি আঁকৃতে জান্‌তেন। সাদা জমিতে গৈরিক রংঙের রেখা দ্বারাই তাঁরা প্রথমত ছবি আঁকা আরম্ভ কর্‌তেন।

অজন্তা গুহার এক এক দেয়ালে এক এক ধরণের (style) ছবি। তা'তে বেশ বোঝা যায় যে, গুহা-গুলি একটা বিরাট শিল্পাশ্রম ছিল এবং গুরু শিষ্যেরা মিলে এক একটা দেওয়ালে ছবি আঁকৃতেন। আমরা অজন্তার দেয়ালে অসম্পূর্ণ ছবিও অনেক দেখেছি ; কিন্তু সে গুলির মধ্যে কতকগুলি অস-ম্পূর্ণ হ'লেও দেখে মনে হ'ল যেন কোন ওস্তাদেরই হাতের কাজ। ২ নম্বর গুহায় এরকম অসম্পূর্ণ কাজের

সংখ্যা অধিক। অপরিপক্ক হাতের কাজও কোন কোন দেয়ালে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

গুহার খোদিত-শিল্পেও চিত্রশিল্পীরা রং দিতে ছাড়েন নি। ২ নম্বর গুহার বারান্দায় দেখ্‌লুম, থামের উপর এবং থামের ধারে ধারে সাদা স্ফুটালোক-রেখা (high-light) দিয়ে থামের গঠন ফুটিয়ে তোলা হ'য়েচে। সেই নির্জ্জন ইন্দ্র-পুরীতুল্য গিরিগুহার নির্ঝরিণীর পাশে, স্তব্ধ স্নিগ্ধ ভাবে বিভোর হ'য়ে পুণ্যাত্মা শিল্পীরা যা কিছু এঁকে গেছেন তারই ভিতর থেকে যেন আমরা এক অমৃতময় শান্তি ও আনন্দের বিকাশ দেখ্‌তে পাই। অজন্তার ছবির আর একটি বিশেষ বাহাদুরী এই যে, কোন ছবি কোনটির নকলে আঁকা হয় নি; প্রত্যেকটির ভাব ও বিষয় বিভিন্ন। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিরা তাঁদের কাব্যে যে যে ভাব ব্যক্ত করে গেছেন, অজন্তার ছবিতে সেই সমস্ত ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কালিদাস যেমন বিবাহের বরযাত্রী দেখ্‌বার জন্যে উৎসুক মহিলাদের কাউকে লাজ-বর্ষণ-তৎপরা, কাউকে চুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে,—কাউকে বা আল্‌তা পায়ে দিতে দিতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জানালার উপর ঝুঁকে পাড়ার চিত্র দেখিয়েছেন;—অজন্তাতেও ঠিক্ সেই সমস্ত ভাবের ছবি অঙ্কিত আছে। পদ্মবনে হাতী, হংস-মিথুন, চখা-চখী, মৃগ-মৃগী প্রভৃতি

পূর্ব্ব-কবিদের বর্ণিত বিষয় অজন্তার ছবিতে দেখ্‌তে পাই। পূর্ব্ব-কবিরা যেমন সুন্দরী ললনার উপমায় কৃশাঙ্গী, পীনপয়োধরা প্রভৃতির দ্বারা আকৃতি-বর্ণনা কর্‌তেন, আমরা অজন্তাতে ঠিক্ সেই বর্ণনার অনুরূপ চিত্র দেখ্‌তে পাই। কালিদাসের রঘুবংশে আছে, বন পথ দিয়ে যখন মহারাজ দিলীপ আর রাণী সুদক্ষিণা পুত্রকামনায় বিমানে চড়ে বশিষ্ঠঋষির আশ্রমে যাচ্চেন, তখন তাঁদের রথের শব্দে হরিণ-হরিণীরা কিছু মাত্রও ভীত-ত্রস্ত না হ'য়ে বরং যেন রাজা-রাণীকে দেখ্‌বার জন্যেই পথ ছেড়ে রথবর্ত্মের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে। অজন্তা চিত্রের মধ্যেও একটা ঠিক এই ভাবেরই ছবি আছে।

আমরা ছবিতে এমন-সব অনেক জিনিস আঁকা দেখ্‌তে পাই, যে গুলো আমরা আমাদের ভারতের জিনিস ব'লে মোটেই জানি না। আমাদের বোধ হয় কা'রও ধারণাই নেই যে, 'বগ্‌লস'টা আমাদের দেশে অনেক দিন থেকে চলে আস্‌চে! একটা ঘরে কল্‌কাতার ঠিক কুক্ কেম্পানির ঘোড়ার আড়গড়ার মত অনেকগুলি ঘোড়া আর হুকের উপর সাজসরঞ্জাম টাঙান। দেখ্‌লে সত্যি সত্যি অবাক্ হয়ে যেতে হয়!

অজন্তার ছবি দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদব-কায়দায় যেমন কোট বা কুর্ত্তা

না পর্‌লে সভ্য-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না, এবং অধিক গহনা পরাটা যেমন ভয়ানক বর্ব্বরতা, অজন্তার ছবিতে দেখি, ঠিক্ তার বিপরীত। যত নর্ত্তক-নর্ত্তকী আর সাধারণ লোকদের গায়ে কোর্ত্তা আঁটা, গয়না নেই বল্লেও হয়। আর যত বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকের অঙ্গেই অলঙ্কারের পরিমাণ বেশী। বড় লোকেদের গায়ে কখনও কখনও কোমরে একটা নামমাত্র সূক্ষ্ম উত্তরীয় ফিতের মত ক'রে বাঁধা। আর কোর্ত্তা আঁটা ভৃত্যগণ তাঁদের পার্শ্বে পান-পাত্র কিম্বা আর কিছু নিয়ে একান্ত অনুগত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব সেই সমস্ত দাসেরা বিদেশীয়। যাঁর যত পদমর্য্যাদা ও সম্মান বেশী তাঁর গায়ের গহনার সংখ্যা এবং মূল্যও তত অধিক।

অজন্তায় যে কেবল বড় বড় ছবিই আছে তা নয়। ১৭নং গুহার সাম্‌নের বারান্দার এক পাশে দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড রথের চাকার ভিতর টুক্‌রো টুক্‌রো ছোট ছোট অনেক ছবি সুন্দর ভাবে আঁকা আছে। অজন্তায় যেমন মানুষের চেয়ে বড় ছবি দেখা যায়, তেম্‌নি চার পাঁচ ইঞ্চি ছবিও বিরল নয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাংলা দেশের দৃশ্যের প্রচুর আভাস পাই। প্রথমত আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সব গুলিরই মাটির ছাদ ; কিন্তু অজন্তার

ছবিতে অবিকল বাংলার মত খড়ে-ছাওয়া আটচালা। ওদেশের লোক নারকোল গাছ চোখে দেখেনি ; কিন্তু ছবিতে নারকোল গাছ যথেষ্ট। বঙ্গদেশে ষাঁড়ের দেহের তুলনায় তার স্কন্ধটাই যেমন বেশী উঁচু দেখা যায় অন্য কোন দেশে সেরকম দেখা যায় না। অজন্তার ১নং গুহায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক্ আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। যশোহর মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আঁকা যেসকল চিত্র দেখা যায় অজন্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কন-পদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজন্তার মত অত উৎকৃষ্ট না হ'লেও) একটা অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত হয়। আমাদের দুর্গাপ্রতিমা প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক্ অজন্তার নিয়মেই গোবর মাটির জমির উপর সাদা রং দিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজন্তার ছবির রেখা-কৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান দেখ্‌লেই অজন্তার শিল্পীদের রেখার টানের কথা সহজেই মনে পাড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত দেখে কবির কথায় বল্‌তে ইচ্ছে হয়—

"আমাদেরি কোনো সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়,
আমদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।"

যুগলমূর্তি—কালীঘাটের পট

সঙ্কীর্ত্তন—মেদিনীপুরে প্রাপ্ত পুঁথির পাটা হইতে

অজন্তার বুদ্ধ-মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে চীন ও তিব্বত প্রভৃতি দেশের বুদ্ধমূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য দেখে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, ঐ সকল দেশ থেকে শিল্পীরা এসে অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত চিত্রগুলি রচনা করে গেছেন। বস্তুতঃ সেটা বিষম ভ্রম। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যখন যেখানে গেছে বৌদ্ধ শিল্পও ন্যূনাধিক পরিমাণে তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গেছে। ঐ বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধদর্শন বৌদ্ধ শিল্পকলা দুটো পৃথক জিনিষ ছিল না—একই জিনিষ—ধর্ম্মটিকে বোঝাবার দুটো দিক ছিল মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্র-কলাও নানান দেশে গিয়ে তদ্দেশীয় প্রচলিত শিল্পকলাকে কতকটা ভারতীয়রূপ দিয়েচে তাই এই সামঞ্জস্য বহুল পরিমাণে দেখা যায়। একথা চীন বা জাপানবাসীরা অস্বীকার করেন না। জাপানের সুপণ্ডিত ওকাকুরা ও অন্যান্য অনেক জাপান-বাসীদের মুখে এরূপ শোনা যায় যে, জাপানে যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে সেগুলি ভারতীয় আদর্শে গঠিত এবং অজন্তার বুদ্ধমূর্ত্তির সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য আছে। পুরাতত্ত্ববিদেরা কেহ কেহ এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহও করেচেন। কিন্তু, ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা আবার ভারতের প্রাচীন শিল্প-গৌরবের ভাগীদার হ'তে চান অর্থাৎ তাঁরা ভারতের অজন্তা প্রভৃতির শিল্প-কীর্ত্তিগুলিতে গ্রীক বা রোমীয় শিক্ষার প্রভাব নানান উপায়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা ক'রে থাকেন। Mr. Vincent Smith ও Mr. A. Grünwedel

প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উক্ত মত খুব জোরের সহিত প্রচার করে থাকেন।

ভারত-শিল্পে গ্রীক প্রভাবের বিষয় Mr. Vincent Smith তাঁর মত সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বার উদ্দেশ্যে তাঁর Early History of Indiaয় একস্থানে অজন্তার প্রথম গুহায় অঙ্কিত দ্বিতীয় পুলকেশীর সভায় পারস্য দূতের ছবির কথায় প্রসঙ্গক্রমে বলেচেন—"এই ছবিটিতে যে কেবল অজন্তার অন্যান্য ছবির সময় নির্দ্ধারণ করে তা নয় এরদ্বারা প্রমাণ হয় বা প্রমাণ হওয়ার কাছাকাছি যায় যে অজন্তার চিত্রকলা পারস্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং শেষে গ্রীস্‌ থেকে নেওয়া।" তিনি এ সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধে আরও ব'লেচেন—"যিনিই সমালোচকের চক্ষে ভাল ক'রে অজন্তার ও বাঘ-গিরিগুহার শিল্পের কথা আলোচনা কর্‌তে যাবেন তিনিই এর ভিতর সম-সাময়িক বিশ্বজনীন রোমীয় শিল্পের বিকাশ দেখ্‌তে পাবেন।" Mr. Havell তাঁর Indian Sculpture and Painting নামক পুস্তকে Mr. Smithএর উল্লেখিত মতের প্রতিবাদ করে লিখেচেন—"এখানেও Mr. Smith ইউরোপীয় পুরাতাত্ত্বিকসুলভ অনবধান-প্রবণতার ভাব দেখিয়েচেন।" তিনি লিখেচেন যে—

"ভারতের চিত্রকলা যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বজনীন। বিদে-শীয় চিহ্ন একটু আধ্‌টু বর্ত্তমান থাক্‌লেও এথেন্সের শিল্পকে

যেমন গ্রীসিয়, ইতালীয় চিত্রকলাকে যেমন ইতালীয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগকে ইংরাজী বিভাগ বলা যেতে পারে, অজন্তাকেও ঠিক্ সেইরূপই ভারতীয় চিত্রকলা বলা যায়। অজন্তাগুহায় অঙ্কিত চিত্রগুলিতে ভারতীয় জীবনের এমন জীবন্ত ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, তার ভিতর অন্য কোনো দেশীয় প্রভাবের চিহ্ন-মাত্র আছে ব'লে বোধ হয় না। ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনই ভারতের শিল্পকলাকে অনুপ্রাণিত করেচে। এতে যদি গ্রীক বা রোমের কৃতিত্ব দেখানর চেষ্টা করা যায় তা'হলে বড়ই বাড়াবাড়ি করা হয়। ভারতে যে সামান্য গ্রীক বা রোমীয় শিল্পকলা এসেছিল তার সংশ্রব বেশীরভাগ রাজনীতি ও ব্যবসায়ের সঙ্গেই ছিল, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় বিষয়ের অংশীভূত আদৌ ছিল না।

"যদিও ধরা যায় যে গ্রীকোরোমীয় চিত্র-শিল্পী ও ভাস্করেরা কিছুকাল ভারতের শিল্প-শিক্ষক ছিলেন তথাপি, সেক্ষপীয়রের পাঠশালার শিক্ষক তাঁহার ম্যাক্‌বেথ্ ও কিং লিয়ার বিয়োগান্ত নাটকের ভাবকে যতখানি অনুপ্রাণিত করেছিলেন ধরা যেতে পারে, তাঁরা ভারতীয় শিল্পকলাকে তার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী অনুপ্রাণিত কর্‌তে পেরেছিলেন ব'লে দাবী কর্‌তে পারেন না।"

মিঃ হ্যাভেল আরোও এ সম্বন্ধে বলেন যে ইউরোপ থেকে যদিও কোন শিল্পকলা এদেশে এসে থাকে তবে

তাও ইরোপের শিল্প নয়। প্রাচ্যভূমি থেকে যে শিল্প-কলা নিয়ে ইউরোপ একদিন তার দীন শিল্পকে সম্পদ্‌শালী করেছিল তাই একটু পরিবর্ত্তিত আকারে এদেশে এসেচে। —দেশের জিনিষ দেশে ফিরেচে এইমাত্র। ভিনিসের সেণ্টমার্কের সৌধনির্ম্মাণের সময় থেকে ইতালীয় শিল্প-কলার পুনরুজ্জীবন পর্য্যন্ত অন্যান্য প্রাচ্য শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলা প্রচুর পরিমাণে ইতালী গ্রহণ করেচে। ভারতবর্ষের শিল্প চীন, জাপান, সিংহল, যবদ্বীপ, তাতার-ভূমি, পারস্য, এবং ইতালী, গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপীয় চিত্রকলার পরিপুষ্টি সাধন করেচে বটে, কিন্তু অজন্তার শিল্পকলায় অন্য দেশীয় শিল্পের প্রভাব মোটেই নেই।

"কোনো জাতীয় শিল্পকলার বিষয় আলোচনা কর্‌তে গেলে সেই শিল্পকলা কতখানি অন্যদেশ থেকে গ্রহণ করেচে তা' দেখ্‌লে চল্‌বে না, জগতকে সে কতখানি দান করেচে তার দ্বারাই এর মীমাংসা হ'বে। এই দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে ভারতীয় শিল্পকলাকে কি ইউরোপীয় কি এসিয়ার উন্নত শিল্পকলার উন্নততম দলে স্থান দিতে হয়। পুরাতত্বহিসাবে কোনও উন্নত শিল্পই একেবারে স্বদেশ জাত ও নিজের ভিতর সম্পূর্ণ নয়। এমন কোন শিল্পই নেই যা' অন্য দেশ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেনি ; এবং গ্রীক ও রোমীয় শিল্পও এ নিয়ম থেকে বাদ পড়ে না। ভারতবর্ষ, গ্রীক ও রোম বা অন্যদেশ থেকে তার উপাদান

সংগ্রহ করেচে বটে, কিন্তু সে যা পারস্য থেকে গ্রহণ করেচে তা' ঠিক্ যেন নিজের ব্যাঙ্ক থেকে নিজের নামে টাকা বার করার মত। কারণ একই আর্য্যজাতীর এরা দুটি শাখা মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষ যা' নিজের সমাজের সীমানার বাইরে থেকে গ্রহণ করেচে তার শত গুণ সে নিজের সৃজনী প্রতিভার দ্বারা শোধ করেচে। ভারতবর্ষ যদি এখান থেকে এটা, ওখান থেকে ওটা গ্রহণ ক'রে থাকে,—গ্রীস্ ও ইতালীও তাই করেচে; কিন্তু, ভারত যা গ্রহণ করেচে তার ভিতর থেকে ঢের বড় আদর্শ সে তৈরী করেচে—গ্রীক যা কখনো স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারেনি—যে সৌন্দর্য্য ইতালীরও কখনও হৃদয়ঙ্গম কর্‌বার সামর্থ্য হয় নি। এর ভিতর মানবজাতির নিকট থেকে ভারতের অনেকটা সম্ভ্রম ও কৃতজ্ঞতার দাবী আছে।"

অজন্তার দু এক যায়গায় চীন দেশের লোকের মুখের মত চেপ্টা ধরণের ভিখারী বা ছত্রধারী ব্রাহ্মণের মুখাবয়ব আঁকা আছে দেখেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সেগুলিকে চীন শিল্পীদের আঁকা ব'লে সিদ্ধান্ত করে বসেন। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতে যে কত রকম আকৃতির মানুষ আছে সে বিষয় তাঁরা একেবারেই ভাবেন না। অজন্তার ছবির চেহারার ভিতর কয়েকটি চীনেদের মত চেপ্টা চেহারা আছে বটে, কিন্তু সেগুলির পরিধেয় বস্ত্র গায়ের রং বা অন্য কোন বিষয়ে চীন বা

জাপানের ধার দিয়েও যায় না। সেরূপ আকৃতির মানুষ ভারতেই প্রচুর পরিমাণে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তার জন্যে চীন বা জাপানে যাবার দরকার হয় না।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা ৯ নম্বর গুহাকেই অন্যান্য সকল গুহার চেয়ে বেশী প্রাচীন বলেন,—কেন জানি না। তাঁরা বোধ হয়, ঐ গুহার অনেকগুলি ছবিতে অপকৃষ্ট অসভ্যের আকৃতি দেখ্‌তে পান ব'লে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু সেই গুহাটাতেই আবার আমরা 'বুদ্ধদেবের প্রচার' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ছবিও দেখেছি। তবে, থামের গায়ে যে খোদিত লিপি আছে সেইটে ধরে' যদি তাঁরা কিছু আবিষ্কার করে থাকেন ত সে কথা স্বতন্ত্র।

আমরা অজন্তার ছবিগুলিতে মাত্র দু-এক যায়গায় পালি অক্ষরের মত লেখা দেখেছিলুম। আর পাথরের দেওয়ালের উপর খোদা লেখাও দু একটা গুহাতে পেয়েছি। সেগুলিতে পুরাতত্ত্ববিদের জান্‌বার বিষয় অনেক থাক্‌তে পারে। আমরা এক, দুই, নয়, দশ, ষোল, সতের, উনিশ প্রভৃতি নম্বরের কতকগুলি গুহা ভিন্ন আটাশটা গুহার মধ্যে অন্য কোনটাতে বড়-একটা ছবি দেখ্‌তে পাইনি। পথ না থাকায় একটা গুহাতে ত একেবারে যাওয়াই গেল না। অল্পসংখ্যক কতকগুলি গুহা অসম্পূর্ণ ভাবে পড়ে আছে। কোনটার কেবল

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ

বারান্দাটুকু মাত্র খোদা হয়েছে, কোনটা কেবলমাত্র খুদ্‌তে আরম্ভ করা হয়েছিল পাহাড়ের গায়ে বাটালীর দাগ এখনও বেশ পরিষ্কার ফুটে আছে। দেখ্‌লে মনে হয় যেন এইমাত্র শিল্পীরা বসে বসে কাট্‌ছিল, পরিশ্রান্ত হয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেছে। কতকগুলিতে পূর্ব্বে ছবি ছিল কিম্বা আঁকা হচ্ছিল—কালে মাটি চাপা পড়ে সেগুলি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অজন্তার বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও তাকে অক্ষয়-ভাণ্ডার বলা চলে। যে সব ছবি এখনও বর্ত্তমান আছে সে গুলির আমরা কেউ যদি আজীবন ধরে প্রতিলিপি করি তবে, এ জীবনে সেগুলি শেষ করে উঠ্‌তে পারি কিনা সন্দেহ!

আমি এইবার অজন্তার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ছবির বিষয় কিছু বল্‌ব। প্রথম নম্বর গুহায় আমরা একটি বিশাল, সৌম্য, ও সুন্দরকান্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের ছবি গুহাটিকে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে দেখ্‌তে পাই। সেখানি বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের চিত্র ব'লে মনে হয়। সেই ছবি খানিতে চিত্র-শিল্পীরা বাস্তবিকই তাঁদের মহৎ ও উদার অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়ে গেছেন; কেন না, তাঁদের মন সেরূপ উচ্চ না হ'লে ছবিতে তেমন বিশ্বপ্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা ভাব কখনই তাঁরা দেখাতে পার্‌তেন না। সাধারণতঃ কবির লেখায়, আর চিত্রকরের চিত্রে তাঁদের চিত্তের

ভাব প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায়। ১ নম্বর গুহার মধ্যে "বুদ্ধদেবের প্রলোভন" ছবি খানিও সুন্দর ভাবব্যঞ্জক!

সে ছবি খানিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরিবেষ্টিত হ'য়ে ভগবান বুদ্ধদেব অটল-গম্ভীর ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন! তিনি শত-সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থেকেও তাদের চেয়ে ঢের তফাতে যেন কোন্ এক শান্তির আলোকময় রাজ্যে ভাস্‌চেন! আর তাঁর জড়-তনু খানি সেখানে প্রাণশূন্য হ'য়ে পুতুলের মত বসে আছে! এদিকে আশে-পাশে চারিদিকে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুরা তাঁকে প্রলোভিত করবার জন্যে যার-যতদূর-সাধ্য চেষ্টা কর্‌চে। কাম সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি ধরে, লোভ চারুবেশে, মোহ দানব সেজে, মদমাৎসর্য্য প্রভৃতিরা প্রত্যেকে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরে তাঁকে প্রলোভিত কর্‌বার জন্যে নানান রকম কৌশল কর্‌চে। রাজসভায় দুজন পণ্ডিতের তর্ক-বিতর্কের ছবিখানি অত্যন্ত কৌতুক-জনক। ১ নম্বর গুহায় যে একটা প্রকাণ্ড ভীষণ-দর্শন সাপের ছবি আছে সেটা এত স্বাভাবিক যে, হঠাৎ দেখ্‌লে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌তে হয়!

১৭ নম্বর গুহায় উৎকৃষ্ট ছবির সংখ্যা কিছু বেশী। অন্যান্য ভাল ভাল ছবির মধ্যে ভিখারী-বেশী বুদ্ধদেবের সাম্‌নে মাতৃমূর্ত্তির ছবি খানিতেই গিরিগুহাটি অলঙ্কৃত করে তুলেছে। মা ছেলের হাত দুখানি ধরে তাকে দিয়ে

বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতে গেছেন, অবশেষে মহাত্মা বুদ্ধদেবের সৌম্যোজ্জ্বল-কান্তি দেখে, ভক্তি-বিহ্বল হ'য়ে তাঁর চরণ-প্রান্তে পুত্রসমেত নিজেকে নিবেদন করতে যাচ্ছেন! অন্তর্যামী বুদ্ধদেবও যেন তার মনোগত ভাব বুঝতে পেরে নত হয়ে তাদের দেওয়া ভিক্ষা সাদরে গ্রহণ করছেন! ভিক্ষাপাত্রধারী বালকটির মুখে সরল-নির্ভীক হৃদয়ের মাতৃভক্তি ও আনুগত্যের ভাব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে! বুদ্ধদেবকে দেখলে মনে হয় যেন তাঁর অন্তর-নিভৃতে কি এক কোমল করুণ সুর বাজ্‌চে, তাই তিনি অপরের বেদনায় ব্যথিত, দুঃখে দুঃখিত, এবং বিশ্ব-প্রেমে বিহ্বল। এক কথায়—ছবি খানিতে জননীর স্নেহ, ভক্তের প্রেম, বুদ্ধদেবের করুণা এবং পুত্রের আনুগত্যের ভাব সুন্দর ফুটেছে! বুদ্ধের ছবি খানি মাতৃমূর্ত্তির দ্বিগুণ বা ততোধিক বড়। তা'তে বোধ হয় যে, মাতৃমূর্ত্তির হৃদয়পটে মহাতাপস বুদ্ধদেবের যে বিশাল ও উদার ছবি খানি প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই ভাবটা দেখাবার জন্যেই শিল্পী বুদ্ধ-মূর্ত্তিটিকে অত বড় করে এঁকেছিলেন। বুদ্ধ-দেবের ছবির এখন শুধু ছাপটুকুই বর্ত্তমান; রেখাবলী প্রায় সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তাতেও তার সৌন্দর্য্য লোপ পায়নি।

১৭ নম্বর গুহায় সিংহল-বিজয়ের ধারাবাহিক চিত্র আমরা দেখ্‌তে পাই। কেমন করে বাংলার জাতীয় বীর

বিজয়সিংহ সেই কোন্ প্রাচীন কালে ঝঞ্ঝামুখর সিন্ধুবক্ষে অর্ণববাহিনী ভাসিয়ে সুদূর সিংহলে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং যে রাবণের স্বর্ণলঙ্কাকে শ্রীরামচন্দ্র অত আয়াস—অত কষ্ট স্বীকার ক'রে তবে আয়ত্ত করেছিলেন, সেই লঙ্কাকে বিজয় কিরূপে হেলায় জয় করে বাংলার বিজয় নিশান উড়িয়েছিলেন তার ছবি অজন্তার ভিত্তি-গাত্রে আজও জীবন্তভাবে জাজ্বল্যমান।

বিজয়সিংহের অর্ণবপোত সিংহলের উপকূলে এসে লেগেচে ;—সে দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে—কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী বিজয়কেই বরণ কর্‌লেন ; সিংহল বিজয়ের পদানত হল। বিজয় বিজয়গর্ব্বে যেন মেদিনী কাঁপিয়ে রাজধানীর ভিতর সসৈন্যে প্রবেশ কর্‌চেন—পুরীমধ্যে নাচ গান প্রভৃতি বিজয়োৎসব পড়ে গেছে ! সে দৃশ্য দেখলে বাস্তবিকই আমাদের হৃদয় জাতীয় গরিমায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং—

'একদা যাঁহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাঁহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগর ময়'

—সেই বঙ্গ-মাতার চরণোপান্তে গভীর ভক্তিভরে মাথা আপনিই নত হয়ে পড়ে !

সাতশো বাঙালী নিয়ে পিতৃরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত বিজয়সিংহ সিংহলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে দেশ জয় করে তার উপর পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রভাব বিস্তার

কর্‌লেন। যদিও মহাবংশপুরাণে যক্ষ-যক্ষিণী প্রভৃতির অবতারণা করে বিজয়সিংহকে তার ভিতর জড়িয়ে ফেলা হয়েচে তবু বিজয়ের ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করা চল্‌তেই পারে না। মহাবংশপুরাণের ঐ অতিমানুষিক অংশটুকু বাদ দিলে খাঁটি সত্যটি আপনিই ধরা পড়ে। বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয়ের দ্বারা সেখানে যে বাংলার ও বাঙালীর প্রভাব খুবই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কারণ একটা জাতি কোন দেশ জয় ক'রে যদি সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে ও বংশানু-ক্রমে রাজত্ব কর্‌তে থাকে, তাহলে, বিজয়ী জাতির জাতীয় ও স্বদেশীয় প্রভাবের দ্বারা সেদেশ যে বিশেষভাবেই আক্রান্ত হয় তা বলাই বাহুল্য; এ স্থলেও তাই হয়েছিল। সিংহলের সভ্যতার প্রবর্ত্তন বাঙালীই করেছিল এবং সেটা পরিপুষ্টও করেছিল সেই বাঙালীই। বাঙালীর কীর্ত্তি-কলাপ আজও সিংহলে বিস্তর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেখানকার লোকেদের বেশভূষা, বিশেষত—মেয়েদের কাপড়পরা ও কেশরচনার ধরণ দেখ্‌লে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। সুসভ্য সিংহলীরা নিজেদের বাংলার লোক ও বাংলাকে মাতৃভূমি বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করে থাকেন।

অন্যান্য বিষয় ছাড়া সিংহলীয় চিত্রশিল্পেও আমরা বাংলার ধাঁচ খুব অধিক পরিমাণেই দেখ্‌তে পাই।

সিংহলের 'সিগিরিয়া' গিরিপ্রাচীরের ছবিগুলির সঙ্গে বাংলার পটের অঙ্কনপদ্ধতির অদ্ভুত মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অজন্তার অঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে সিগিরিয়ার অঙ্কন-পদ্ধতির মিল খুব ঘনিষ্ট বলেই বোধ হয়। Dr. A. K. Coomaraswamy তাঁর Indian Drawings নামক পুস্তকে বিশেষ ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করেছেন। সিগিরিয়া ও অজন্তা উভয় স্থানের চিত্রেই যে বাঙালীর হাত খুব বেশী রকমই ছিল, এথেকে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

সিংহলবিজয়ের চিত্রগুলিতে আমরা প্রাচীন যুদ্ধপ্রথার আদর্শ দেখ্‌তে পাই। রামায়ণ মহাভারতে উল্লিখিত শূল, শেল, নারাচ, বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের ছবি এখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এক জায়গায় একটা মিছিলের চিত্রে কতকগুলি লোক আনন্দে চীৎকার কর্‌চে, কতকগুলি লোক হাতীর পিঠে চ'ড়ে ভেঁপু বাজাচ্চে। তাদের ভাব-ভঙ্গি একমনে কিছুক্ষণ দেখ্‌লে ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের কিম্বা কলকাতার বড়লোকদের বিবাহের সমারোহ-কোলাহল কানে যেন খুব স্পষ্ট ভাবে এসে বাজে। ছবিতে এরকম ভাব দেখান কম ক্ষমতার কাজ নয়। মৃগয়ার ছবিগুলিও বেশ চিত্তরঞ্জক। সেগুলি আজকালকার মত 'ফাঁসকল' পেতে শীকার করার ছবি নয়। হরিণদের স্বাভাবিক

ধাবমান মৃগ

ভয়-বিহ্বল, চকিত, চপল ভাব আর শিকারীদের মৃগয়া-কৌশল তাতে সুস্পষ্ট।

নর-নারীর বিলাসচিত্র ও দাম্পত্য প্রেমের ছবিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৭ নং গুহায়, প্রবেশ-দ্বারের উপর কতকগুলি দম্পতির ছবি উল্লেখযোগ্য। ২ নং গুহায় এক জায়গায় কোন কামিনী বসন্ত-আগমনে হৃষ্টচিত্তে বাসন্তী-রঙের কাপড় প'রে দোলায় দুল্‌ছে; তার আননে ও গঠনে যৌবনের উজ্জ্বল উৎফুল্ল ভাব সুন্দর ফুটেছে। ২ নং গুহায় একস্থানে দুয়ারের দুধারে দুটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একতলার সমান বড় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। সে দুটির মধ্যে একটি এখন অস্পষ্ট ছায়াকার হয়ে পড়েছে আর একটির কেবল শ্বেত-শতদলের উপর চরণ-কমল দুটি মাত্র অবশিষ্ট। রাতুল-চরণ দুটি এত সুন্দর ও ভাবপূর্ণ যে, তার নীচে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে হয়! আবার ঐ গুহাতেই গগণচারিণী দেবকন্যাদের ছবির কতকগুলি পা-মাত্র অবশিষ্ট আছে—অতি আশ্চর্য্য-ভাবে সেগুলি আঁকা! সেগুলি দেখ্‌লেই তারা যে শূন্যে মেঘের কোলে ভাস্‌চে সে বিষয় কোন সন্দেহই থাকে না। ১৯ নম্বর গুহার এক জায়গায় একটা পুষ্পিত পলাশ গাছের গুঁড়ির উপর সারবন্দী পিঁপ্‌ড়ের দল উঠ্‌ছে। শিল্পীরা একটা সামান্য পিঁপ্‌ড়ে থেকে হাতী ঘোড়া লোক-লস্কর প্রাসাদ-প্রাচীর—দুনিয়ার কিছুই যেন বাদ দেন্‌ নি।

খানিকক্ষণ ধ'রে ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা এমন তন্ময় হয়ে পড়্‌তুম যে, বাইরের সমস্ত বিষয়, এমন কি নিজেদের বিষয়ও যেন ভুলে যেতুম! আমাদের মনে কেবল সেই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা যেন জেগে উঠ্‌ত। আমরা যখন যে ছবির কাছে দাঁড়াতুম তখন, এজগতের সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে তাতেই ডুবে যেতুম! হয়ত, কোন একটা মিছিলের ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হ'ত, আমরাও বুঝি সেই মিছিলেরই দলভুক্ত হ'য়ে পড়েচি—জনতা দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের কোলাহলে যোগ দিতে ইচ্ছা হ'ত। কখন হয়ত, কোন পারিষদ্‌বর্গ-পরিবেষ্টিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাজার দরবারের ছবি দেখে মনে হ'ত, যেন, ত্রেতাযুগে অযোধ্যানাথ শ্রীরামচন্দ্রের চরণে কোন বিষয়ের প্রার্থী হয়ে এসেছি! কোথাও যদি গানবাজ্‌না হচ্চে এরকম ছবি দেখ্‌তুম, ত সেখানে শ্রোতা হয়ে যেতুম! চির-মৌন ছবিতেও যেন রাগ-রাগিণী বেজে উঠ্‌তো! চিত্রে এরকম আশ্চর্য্য ভাব খুব কমই দেখা যায়। ছবিগুলি দেখে ঠিক যে-ভাব মনে উদয় হ'ত তা ভাষায় জানান সম্ভব নয়। এ জীবনে সেই সব ভাব আর কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না। অজন্তার ১ নম্বর গুহা থেকে বুদ্ধদেবের জীবনের বাল্যের ঘটনা আরম্ভ করে, ২৬ নং গুহায় তাঁর মহা-নির্ব্বাণের চিত্র দেওয়া আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক

স্থানে তখনকার প্রচলিত উপকথা ও জাতকাদির গল্পের ছবি আছে।

অনেকে অজন্তার ছবিকে নগ্ন বলে উপহাস করে থাকেন; কিন্তু পাশ্চাত্য-অর্থে নগ্ন ছবি অজন্তার কোথাও নাই। পাশ্চাত্য ছবির নগ্নতা নগ্নতাটাকেই বিশেষ করে চোখের উপর তীব্রভাবে ধরে দেয়, শিল্পীদের দেহাবয়বের নগ্ন-সৌন্দর্য্য দেখান ছাড়া যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে তা বোধ হয় না; কিন্তু অজন্তার ছবিতে যে অর্দ্ধ-নগ্নভাব আমরা দেখ্‌তে পাই তার কারণ কতকটা তখনকার-দিনের বসন-ভূষণের সরলতা। আরও একটা কারণ এই যে, অজন্তার শিল্পীরা বেশভূষার জাঁকজমক দেখিয়ে কেন্দ্রগত ভাবটিকে চাপা দিতে চাইতেন না। সেই জন্যেই তাঁদের চিত্রের সর্ব্বাঙ্গ এমন প্রাণপূর্ণ ও সজীব হ'ত যে তাতে সমস্ত নগ্নতা চাপা পড়ে গিয়ে সেই ভাবটিই পরিপূর্ণ হয়ে ফুটে উঠ্‌তো!

১৭ নং গুহায় কোন রাজার হাতীধরার কতকগুলি চমৎকার চিত্র আছে। মহারাজ রাজছত্রবাহক-সমভি-ব্যাহারে ঘোড়ায় চ'ড়ে, আশে-পাশে খোলা তরোয়াল হাতে লোক-লস্কর, আগে আগে একটা পোষা হাতী তারও আগে দুতিন জন বল্লমধারী ওস্তাদ-লোক বুক ফুলিয়ে মহোল্লাসে চ'লেচে! আবার সেই চিত্রেরই পরবর্ত্তী চিত্রে হাতীর দল অরণ্যে নিরুদ্বেগে মৃণাল ভক্ষণ কর্‌চে ও

ছড়াচ্চে! বন্যহাতীর আনন্দলীলার ছবি এমন ভাবে আঁকা যেন তাদের পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে পরাধীন কর্‌তে ইচ্ছে করে না! তারপরেই আবার এক দৃশ্য! তাতে করী করতলগত হ'য়ে পড়েচে।—মহোল্লাসে রাজার লোক-জন কেউ হাতীর পশ্চাতের দুই পায়ে দড়ি বেঁধেচে,—কেউ তার শুঁড়ে দড়ি বেঁধে টান্‌চে, এইরূপে তাকে ব্যতি-ব্যস্ত ক'রে তুলেচে।

১ম নম্বর গুহায় দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-বংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভায় পারস্যরাজ দ্বিতীয় খস্‌রুর দূত-প্রেরণের ছবি আঁকা আছে। এই ঘটনা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে। ছবিখানি অবশ্যই তার পরবর্ত্তী সময়ে অঙ্কিত।

অনেকে বলেন, অজন্তার শিল্পীরা মোগল বা অন্যান্য শিল্পীদের মত কোন লোকের হুবহু প্রতিকৃতি (Portrait) অঙ্কন কর্‌তে পার্‌তেন না। কিন্তু একথার কোন যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লুম না। অজন্তার ছবিতে লোকজনের কত রকমের চেহারার এবং ভাবের বৈচিত্র্য দেওয়া আছে তা' নির্ণয় করা অসম্ভব। ১ নং গুহায় একটা দেয়ালে তৎকালের কোন রাজার বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণ এবং বৈরাগ্যের যে সকল ছবি আছে সে গুলিতে রাজার প্রতিকৃতির কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটেনি অর্থাৎ রাজার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিত্রে ঠিক একই প্রতিকৃতি রক্ষিত হ'য়েচে।

সেই ছবিগুলির প্রথম চিত্রে রাজা বিলাস-আগারে সিংহাসনে সুঠাম ভঙ্গীতে সহাস্যে উপবিষ্ট আছেন। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ নর্ত্তকনর্ত্তকীদের নাচ-গান বংশীবাদন-ধ্বনিতে মুখরিত। এদিকে অন্দরের রান্নাঘরে হৈ চৈ—বাঁটনা-বাঁটা কুট্‌নো-কোটার ধূম প'ড়ে গেছে! একজনের চোখে লঙ্কা লেগে গেছে,—তিনি চোখ রগ্‌ড়াতে ব্যস্ত! যেন চারিদিকে আনন্দের হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেছে! পরবর্ত্তী চিত্রে সেই নৃপতি তথাগতের চরণসন্দর্শণার্থে হাতীতে চ'ড়ে লোকজনের আনন্দকোলাহলে যেন আকাশ বাতাস পূর্ণ ক'রে চলেচেন! তার পরের ছবিতে ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারের সভার চিত্র এবং রাজার শুভাগমন। তিনি বুদ্ধের চরণ-কমল-তলে দীনভাবে উপবিষ্ট। তথাগতের সস্মিত ও শান্তোজ্জ্বলভাব এবং শ্রোতৃমণ্ডলির বিমুগ্ধভাব চিত্রটিতে ভারি সুন্দর ফুটে উঠেচে। পুনরায় সেই নরনাথের অন্দরমহলের ছবি। রাজা ও রাণী পরিচারিকাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হ'য়ে রাজাসনে ব'সে আছেন। ভূপতি রাণীকে বুদ্ধদেবের বৈরাগ্যধর্ম্মের কথা ব্যাখ্যা কর্‌চেন; কিন্তু রাণী তাতে তাঁকে বিরত কর্‌বার অশেষবিধ চেষ্টা কর্‌চেন। তারপরে আবার সেই রাজা তাঁর অতুল বিভব ও স্ত্রী-পুত্র বিসর্জ্জন দিয়ে সংসার ত্যাগ ক'রে অশ্বারোহণে তাঁর একমাত্র প্রভুভক্ত ভৃত্যের সঙ্গে বন-গমন কর্‌চেন। রাজভক্ত প্রজারা

তাঁকে সংসারত্যাগে বিরত ক'রে ফেরাবার জন্যে তাঁর অনুগামী হ'য়েচে। এইবার তিনি তাঁর ভৃত্যকে নিয়ে একটি নৌকায় চ'ড়ে দুস্তর সমুদ্র-যাত্রা ক'রেচেন।—যেন তিনি সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হ'য়ে কোন্ সুদূর রাজ্যে চ'লেচেন! শেষ ছবিটিতে রাজা এক নির্জ্জন দ্বীপে গভীর অরণ্যের ভিতর এক শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হ'য়ে তাঁর ভৃত্যকে ঐস্থান পরিত্যাগ ক'রে রাজ্যে ফিরে যেতে আদেশ দিচ্চেন; কিন্তু ভৃত্য তার প্রভুকে অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে ফির্‌তে কিছুতেই সম্মত নয়, আমরণকাল প্রভুর চরণ-সেবার সে প্রার্থী!

অজন্তা প্রভৃতির প্রাচীন ছবিতে রাজার মাথার যে মুকুট দেখা যায় এগুলির নমুনা আজকাল বিবাহের টোপরে আমরা কতকটা পাই। অবশ্য পূর্ব্বের রাজমুকুটের তুলনায় টোপর কিছুই নয়। পূর্ব্বকালের নকলে আজকাল যে বিবাহে রাজবেশ করার প্রথা প্রচলিত আছে বোধ হয় তার সেই রাজ-মুকুট এখনকার সোলার টোপরে পরিণত হ'য়েচে। বৌদ্ধ আমলের মন্দিরগুলির বাহ্য আকৃতিও অনেকটা প্রাচীন রাজমুকুটের মত। মাথার মুকুট ছাড়া কতরকম কিরীট, পাগড়ী টুপি গহনা প্রভৃতির বহুসংখ্যক অভিনব চিত্র দেখা যায়। অজন্তার চিত্রে মহিলাদের বেণী-রচনার রীতি ভারি বিচিত্র ধরণের। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় ইউরোপীয় মহিলাগণ যে সকল রকমারি কায়দায় বেণী-

নাগকন্যা

রচনা করেন, অজস্তার চিত্রে অঙ্কিত বেণী-রচনা তদপেক্ষা কোন অংশেই হীন বা বৈচিত্র্যহীন নহে। পরিধেয় বস্ত্রেরও বৈচিত্র্য বড় কম দেখা যায় না। তবে, অধিকাংশ ছবিতেই নানান ধরণের ডুরে কাপড় আঁকা দেখা যায়। রাক্ষসীর বিকট আকৃতি, জলকন্যার অর্দ্ধ সর্পদেহ, বিমান-চারী কিন্নর-কিন্নরীর অর্দ্ধেক পাখী ও অর্দ্ধেক মনুষ্যাকৃতি ভারি কৌতুকাবহ। অজন্তার ছবিতে আস্‌বাব-পত্রের মধ্যে অনেক আধুনিক বিংশশতাব্দির সভ্যতার অনুরূপ জিনিস দেখা যায়। ডিকেণ্টারের মত পাত্র, সুদৃশ্য কুঁজো, ফুলদান প্রভৃতির ছবি দেখা যায়।

অজন্তার চিত্রগুলির কথা বল্‌তে গেলে ইচ্ছে হয় সমস্ত চিত্রগুলির কথাই বলি, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় আরও দুএকটি চিত্রের কথা ব'লেই এ-বিষয় শেষ কর্‌বো। ১ নম্বর গুহায় দুটি বুদ্ধদেবের স্বর্গলোকে মাতৃদেবীর কাছে তাঁর নির্ব্বাণ-ধর্ম্মপ্রচারের ও তথায় তাঁর অভিষেকের ছবি দেওয়া আছে। প্রথম চিত্রটিতে বুদ্ধদেব দেবকন্যা-পরিবেষ্টিতা মাতাকে তাঁর ধর্ম্মপ্রচার এবং নিজপরিচয় প্রদান কর্‌চেন। তিনি একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনে ব'সে—হাতে একটি ভিক্ষাপাত্র। তিনি তাঁর জননীকে নিজপরিচয় দিয়ে যেন বল্‌চেন—"মা, তুমিই আমার জননী!" কিন্তু, বিষ্ণুর অবতার-স্বরূপ ভগবান বুদ্ধদেবকে তিনি

পুত্র বল্‌তে যেন কোন মতেই সাহস পাচ্চেন না !—তাই ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে তথাগতকে নমস্কার করতে যাচ্চেন। অন্যান্য দেবকন্যারা যেন ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ্য হ'য়ে শুধু নির্ব্বাক নিস্পন্দ অবস্থায় অবস্থান কর্‌চেন। অপর চিত্রটিতে বুদ্ধদেবের মুখে আনন্দ ও গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন দেখা যায়। তিনি একটি বহুমূল্য প্রস্তরখচিত মুক্তার ঝালর-দেওয়া থামওয়ালা বারান্দার মাঝে সিংহাসনে উপবিষ্ট। পিছন থেকে দুজন কারুকার্য্যখচিত দুটি ঘট হাতে তাঁর সুকুঞ্চিত কেশ অভিষিক্ত ক'রে স্তব্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে। সাম্‌নে একজন দেবকন্যা তাঁর আজ্ঞার প্রতীক্ষায় বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে চামর ব্যাজন কর্‌চে। একটি বামন—'বেঁটে-বক্কুর' মত কৌতুকাবহ—ভৃত্যকে থালা-ভরা উপচার-সম্ভার নিয়ে অতিকষ্টে একটা বাঁধান সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠ্‌তে যাচ্চে, তাকে সাহায্য কর্‌বার জন্যে আর একজন দেবকন্যা বারান্দা থেকে সিঁড়ির দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে থালাটা ধ'র্‌চেন। আর একধারে গাছ-পালার পাশে বারান্দার প্রান্তভাগে মুনিঋষিদের বিদায় করা হ'চ্চে ; কেউবা আল্পে সন্তুষ্ট কেউবা মহা অসন্তুষ্ট হ'য়ে দক্ষিণার জন্যে গোলযোগ উপস্থিত কর্‌চেন। অজন্তার ছবিতে বারান্দা প্রভৃতির থাম এবং গৃহসজ্জা বহুমূল্য মণিমাণিক্যে খচিত। সেগুলিতে কোথাও বা চুম্‌কি মুক্তার ঝালর টাঙান, কোথাও বা নীলকান্তমণি, চুনি,

পান্না প্রভৃতি পাথরে খচিত কারুকার্য্য দেখা যায়, তাতে ছবিগুলিকে আরও অলঙ্কৃত করে তুলেচে। এখনকার পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেমন উচ্চ কাষ্ঠাসনে (chair) বসার রীতি প্রচলিত, অজন্তার চিত্রে দেখা যায় তখনকার গণ্যমান্য সকলেই উচ্চ কাষ্ঠাসনে—কতকটা জলচৌকীর মত আসনে—উপবেশন করত।

Dr. Ananda K. Coomaraswamy মহোদয় তাঁর বিখ্যাত Indian Drawings নামক পুস্তকে Mrs. Herringham এর ও তাঁর নিজের মতামত বিষয় যা' লিখেচেন সে বিষয় উল্লেখ ক'র্লে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

Dr. Coomaraswamy বলেন—

"প্রাচ্য শিল্প-কলা স্থূলতঃ পরিকল্পনা ও গঠন নৈপুণ্যের দ্বারাই বোঝা যায়। একটা জাঁকজমকের সৃষ্টি ক'রে অথবা চিত্রের মধ্যে উঁচু-নীচু ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রে কখনও চিরন্তন-প্রথার গণ্ডি অতিক্রম করা হয়নি। যেখানে খুব জম্‌কালো রং ছবিতে দেখা যায় সেখানে রং দেওয়ার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে এবং ছায়া-সম্পাত (shading) খুব অল্প পরিমাণেই তাতে করা হ'য়েচে। এমন কি, অজন্তাতেও যেখানে বর্ণ-বৈচিত্র্যের উপর বেশী নজর দেওয়া হ'য়েচে এবং কালো সাদা লেপন করা হ'য়েচে সেখানে অঙ্কনদক্ষতা বিশেষ উল্লেখ-

যোগ্য। ছবির সব চেয়ে প্রধান অঙ্গ হ'চ্চে সাদা জমীর উপর লালবর্ণে আঁকা সুস্পষ্ট রেখাগুলি এবং উহাই চিত্রের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। অনেক লেখকই অজন্তার শিল্পীদের রেখাঙ্কনের অসামান্য অধিকারের প্রংশংসা করেচেন। ... সম্প্রতি Mrs. Herringham অজন্তার শিল্প সম্বন্ধে লিখেচেন—'এই চিত্রগুলি এরূপ সুদক্ষভাবে আঁকা হ'য়েচে যে, এতে যেখানে সূক্ষ্ম বা যেখানে স্থূলভাবে আঁকার প্রয়োজন ঠিক্ সেই প্রয়োজনীয়তার তারতম্য অভিজ্ঞ শিল্পীরা সম্পূর্ণ জেনেশুনেই সুন্দররূপে বজায় রেখেচেন। কতকটা লিখন-ভঙ্গীর মত অঙ্কনকার্য্য এরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করা হ'য়েচে যে, সমস্ত রং ক্রমশঃ নষ্ট হ'য়ে গিয়ে ভিতরকার স্তরের আঁকাটি বের হ'য়ে পড়ায় এমন জীবন্ত অঙ্কন আজ চোখের সাম্‌নে খুলে দিয়েচে যে, এই ধ্বংশের জন্যে লোকের অল্পই পরিতাপ হয়।'

"এই প্রাচীন প্রাচীর-গাত্রাঙ্কিত চিত্রে তুলিকাপাতের যে অকুণ্ঠ ও অবলীলভাব তাহা সহস্রবৎসর পরবর্ত্তী মোগল শিল্পকলায়ও দেখা যায় না। ইহা সমসাময়িক যে, কোন ইউরোপীয় চিত্রশিল্প অপেক্ষা সমধিক উন্নত এবং পরবর্ত্তী চৈনিক চিত্রকলার চেয়ে অনেক গম্ভীর ও আন্তরিক মানবীয় ভাবাপন্ন। অধিকন্তু, অজন্তা চিত্র-পরিকল্পনার বিরাটতা ও উদার-ধারণার জন্য জগতে শিল্পকলার ইতিহাসে

শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার ক'রেচে এবং বোধ হয় একমাত্র পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন ইতালীয় শিল্পকলাই সে গৌরবের একমাত্র সহাধিকারী।"

Mr. griffiths অজন্তার বিষয় তাঁর The Paintings in the Buddhist Cave-Temples of Ajanta নামক পুস্তকে একস্থানে লিখেচেন—

"হিন্দুদের তন্বঙ্গ ভাবটি প্রতীচ্যদের বরাবরই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। সেই কমনীয় ও সহজভঙ্গিমাময় মূর্ত্তিগুলি যেন অন্য জগতের ব'লে মনে হয়, এবং তাদের ভাবসূত্রটি পেশীবহুল-বপু প্রাচীন ইয়োরোপীয় আদর্শে অভ্যস্থ চিত্রকরদের ধারণার অতীত। গ্রীক আদর্শের প্রতি একটা ঝোঁক বা অস্থিসংস্থান সম্বন্ধীয় ধারণা অজন্তা গুহার চিত্রকরদের মনে উদিত হ'য়ে তাঁদের মানসী-আদর্শের ভাবব্যঞ্জনার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করেনি। ... বাদাম-আকৃতি চক্ষুর অতিরঞ্জন বোধহয় একটা বিশেষ ধরণ ছিল। একজন ইংরাজের চক্ষে হয়ত প্রাচ্যদেশের প্রিয় 'চেপে-বসার' ভঙ্গীটির বড় বাহুল্য ব'লে বোধ হবে। হাতগুলি অপূর্ব্ব লীলার ভঙ্গীতে আঁকা হ'য়েচে এবং যাঁরা ভারতীয় জীবন যাত্রার-সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত, অভিব্যক্তির সত্যটি নানান্ ভাব-সঙ্কেত তাঁদের মনে জাগিয়ে দেয়।"

"... চিত্রে প্রাকৃতিক-ভাব (ভাস্কর্য্যের চেয়ে)

আরো অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। নানান্ ভঙ্গিতে স্ত্রীলোক-দের মূর্ত্তি আঁকা হ'য়েচে এবং মূর্ত্তিগুলি নগ্ন বা স্বল্পাবৃত হওয়ায় শরীরাবয়বের গঠনটি দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। চাতুরীপূর্ণ সুন্দর ভাব ও অর্দ্ধ-বিমুখ (profile) মূর্ত্তি অতি উৎকৃষ্ট ভাবে আঁকা হ'য়েচে। বস্ত্রবিন্যাসও শিল্পীরা খুব সুন্দর ভাবে জান্‌তেন এবং যদিও কাপড়ের ভাঁজগুলি একটু অস্বাভাবিক ভাবে আঁকা হ'ত তবু, পিন, বন্ধনী বা আঁট্‌কাবার অন্য কোনও জিনিষের সাহায্য না নিয়েও যা' মানব-পরিচিত বস্ত্রাদির ভিতর সবচেয়ে সুন্দর, সুবিধা-জনক ও আরামপ্রদ সেই প্রাচ্যদেশের বিনি-সেলাইয়ের কাপড় পরবার ধরণের বিশেষত্বটি সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েচে।"

আমরা স্তম্ভের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখ্‌তে পাই। প্রথম নম্বর গুহার বাইরে বারান্দার উপরে আল্‌সের নীচে মদমত্ত মাতঙ্গদলের যে খোদাই-করা ছবি আছে সেটাতে স্বাধীন বন্য হাতীর স্বাভাবিক চপল ও নিরুদ্বেগ ক্রীড়ার ভাব শিল্পীর অসাধারণ নিপুণতা প্রকাশ করে। ২ নম্বর গুহায় পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট জননীর কোলে শিশু-বুদ্ধের কমনীয় মূর্ত্তি শিল্পজ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক। রাজারাণীর রাজ-জনোচিত গাম্ভীর্য্য ও পিতৃমাতৃজনোচিত অপত্যস্নেহাভিষিক্ত পুণ্যালোকবিমিশ্রিত কমনীয় হর্ষোজ্জ্বল ভাব, আর অশেষলাবণ্যসম্পন্ন বালকের সুকোমল গঠন ও তার মুখাবয়বে ভবিষ্যৎ-মহত্ত্বের নিগূঢ় পরিচয় যেন স্পষ্ট লেখা আছে! তৃতীয় গুহাটি একটি সাজসজ্জাহীন অসম্পূর্ণ ছোট কুঠুরি মাত্র—তাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। চতুর্থ গুহাটি আকারে সবচেয়ে বড় হ'লেও প্রায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় প'ড়ে আছে। তার বাইরের বারন্দার প্রাচীর-গাত্রে খোদা অন্যান্য কতকগুলি খোদিতমূর্ত্তির মধ্যে তথাগতের যৌবনকালের সুন্দর-সুরূপ মূর্ত্তিটিই উল্লেখযোগ্য। ৫নম্বর গুহাটি একটি বিহারগুহা নির্ম্মাণের সূচনা। ৬ নম্বর গুহার দোতলায় দুটি নাতিবৃহৎ বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি, আর দ্বিতল প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে হলের একপাশে একটা ছোট বারান্দার উপর কতকগুলি হাতীর খোদিত চিত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

আমাদের দেশের লোকেরা যেমন কোন-কিছু শুভকার্য্যের প্রারম্ভে ১০৮টি শ্রীশ্রীদুর্গা-নাম লিখে তবে সেই কার্য্য আরম্ভ করেন, তেমনি সাত নম্বর গুহায় ভাস্করেরাও এই অমানুষিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে যেন বল পাবার জন্যে সংখ্যাতীত ধ্যানীবুদ্ধের খোদিত-মূর্ত্তি গড়েছেন। অষ্টম গুহাটি একটি জীর্ণ গুহা—তা'তে বড় কিছু দেখ্‌বার নেই। নবম গুহাটি একটি চৈত্যগুহা। আশ্চর্য্য এই যে, চৈত্যগুহাগুলিতে সূর্য্যালোক প্রবেশের পথ আধুনিক উনবিংশ-শতাব্দীর সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন বাড়ীর Skylight এর মত। নবম গুহায় ভাস্কর্য্যের চেয়ে চিত্রই বিশেষ দ্রষ্টব্য। সুবৃহৎ দশ নম্বরের চৈত্যগুহাটি পাহাড়ের বুক চিরে যে কি-করে আর কত কারিকর মিলেই খোদাই ক'রেছিল তা বলা সহজ নয়।

গুহাগুলি স্থপিত-বিজ্ঞানশাস্ত্র (Architectural Science) অনুযায়ী কোথাও কোন গঠন-দোষ স্পর্শ করেনি। গুহাগুলির সীমারেখা, কোণ, সমতা বা আকার প্রভৃতির কোন যায়গায় কোন ব্যতিক্রম দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ১০, ১২, ১৪, ২১, ২৩, ২৪, ২৫ প্রভৃতি গুহাগুলির অনেক স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর তক্ষন-চিত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ১৩ নম্বর গুহাটি ভিক্ষুদের একটি শয্যগৃহ। গুহাটির ভগ্নদ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'রলে একটা বড় ঘরে পড়া যায়, আর তার তিনদিকে ছোট ছোট ছ'টি

ভাস্কর্য্য

ঘর দেখা যায়। প্রত্যেক কুঠুরিতে তার সঙ্গেই তিনটে ক'রে খোদাই করা পাথরের শয্যা—মায় উপাধান। শয্যাগুলি পাথরে তৈরি হ'লেও এমনভাবে গঠিত যে, পাষাণের উপাধানের উপর মাথা রেখে পাষাণ-শয্যায় শয়ন করলে গায়ে ব্যাথা বা কোন রকম অস্বস্তি বোধ হয় না, না দেখে তা প্রত্যয় করা অসম্ভব ; বরং পার্ব্বত্য-প্রদেশের দ্বিপ্রহরে সেই প্রখর রৌদ্রতাপের সময় সুশীতল গুহাগৃহাভ্যন্তরে পাথরের শয্যায় শুয়ে যেন আরামে চোখ জড়িয়ে আসে !

১৬ নম্বর গুহায় বুদ্ধদেবের কতকগুলি মূর্ত্তি ছাড়া গুহার বাইরে বারান্দার সাম্‌নে প্রবাহের নীচে যাবার একটি সুড়ঙ্গ-পথ আছে। সেই পথে সিঁড়ি দিয়ে ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যে নাগেশের ভগ্ন প্রতিকৃতি আর সেই ঘরটির বাইরে প্রবাহের দিকে বা'র-করা দুটো প্রায় জীবন্ত স্বাভাবিক আকারের হাতীর ছবি খোদাই-করা আছে। হাতী দুটির নাগেশের দ্বারের দিকে মুখ,—যেন পাহারায় নিযুক্ত ! হাতী দুটির গঠন এত স্বাভাবিক যে, শুধু যেন তা'তে প্রাণ প্রতিষ্ঠারই অভাব !

১৭ নম্বর গুহাতে উৎকৃষ্ট চিত্রের সংখ্যাই বেশী। এই গুহাটিতে বৌদ্ধভিক্ষুদের একটি জল রাখবার ঘর আছে। সেই ঘরটিতে সব-সময় জল ভরা থাকে। সিঁড়ি দিয়ে তার উপরে উঠ্‌লে একটি চারকোণা গর্ত্ত ;

প'ড়ে যাবার সম্ভাবনায় এবং জল-তোল্‌বার সুবিধার জন্যে তার মাঝে কাঠের পাটা লাগান থাকৃত। পাটা লাগাবার খাঁজগুলি এখনও বর্ত্তমান। ১৮নম্বর গুহটি একটি মাঝারি রকমের গুহাপ্রকোষ্ঠ। ১৯ নম্বর গুহার বহির্দ্বারের অনেক-গুলি মূর্ত্তি আশ্চর্য্য সুন্দর ও ভাবপূর্ণ! উক্ত গুহাটির প্রবেশ-দ্বারের বহির্ভাগের কতকগুলি মূর্ত্তির মধ্যে সস্ত্রীক নাগরাজের আবেশগম্ভীরমূর্ত্তি আর ১৭ নম্বর গুহার চিত্রের অনুরূপ বুদ্ধদেবের সাম্‌নে ভিক্ষাপাত্র হাতে মাতাপুত্রের একটি মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। ঐ গুহাটিরই অভ্যন্তরে স্তূপের উপর একটি স্থির নির্ব্বিকার দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি গিরিগুহার শোভা-স্বরূপ বিরোজিত! প্রবেশদ্বারের উপর উভয় পার্শ্বে যে দুটি সুন্দর মূর্ত্তি আছে সম্ভবতঃ সেদুটি ধন-কুবেরের ছবি ;—অন্ততঃ তাদের ধনমদমত্তভাব দেখ্‌লে সেইরূপই অনুমিত হয়।

২০ নম্বর গুহা প্রবেশের সোপানের সুচারু গঠন ও আলঙ্করিক কারুশিল্প একান্তই বিস্ময়োৎপাদন করে। প্রায় প্রত্যেক গুহার প্রবেশ-পথের চৌকাঠের সাম্‌নে অর্দ্ধবৃত্তাকার পদ্মাঙ্কিত 'পাপোষ' আছে।

কেন জানিনা, ২২ সংখ্যক গুহাটির সমুখে গেলে হঠাৎ সেটি আমাদের বাংলা দেশের পল্লী-ভবনের কথা মনে পাড়িয়ে দিত। গুহাটিতে পল্লী-কুটিরের মত 'দাওয়া' অর্থাৎ উঁচু বারান্দা।

পরিশিষ্ট

ভাস্কর্য্য

২৬নং গুহাটি একটি ভাস্কর্য্যর ভাণ্ডার! প্রথমতঃ বহির্দ্দেশ-সজ্জায় অন্যান্য গুহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আর ভিতরে যে সমস্ত তক্ষণ-চিত্র আছে—সেগুলি দেখ্‌লে বেশ অনুমিত হয় যে, সেই গুহাটিতে ভাস্কর্য্য বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছে। একটি মহানির্ব্বান-শায়িত বুদ্ধদেবের বিরাট-মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটির মত বড় খোদিত মূর্ত্তি অজন্তার আর কোন গুহায় নাই। বিকারবিহীন মহাতাপস বুদ্ধদেবের সেই মহপরিনির্ব্বাণের মূর্ত্তিটি দেখ্‌লে মন ভক্তি রসে আর্দ্র হ'য়ে ওঠে! তাপস-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের শান্তোজ্জ্বল-মূর্ত্তির পাশে উপায়ান্তরহীনভাবে অবস্থিত ভক্তজনমণ্ডলীর বিষাদস্তব্ধ গম্ভীরমূর্ত্তিগুলিতে জগৎগুরু বুদ্ধের বিয়োগজনিত অসীম শোকভার যেন জীবন্তভাবে ব্যক্ত হ'য়েচে! বুদ্ধের অবেশমাধুরীমণ্ডিত ধ্যান-স্তিমিত লোচন আনন্দ-বিভায় উদ্ভাসিত!—পার্থিব মৃত্যুকে যেন তিনি সত্যই জয় করেছেন—পৃথিবীর দুঃখ সুখে আর তিনি বিচলিত ন'ন। বুদ্ধদেবের মস্তক যে উপাধানে রক্ষিত সেটি প্রস্তর-রচিত হ'লেও এমন ভাবে গঠিত, দেখ্‌লে সুকোমল তুলোর বালিসের চেয়েও যেন নরম ব'লে মনে হয়। ঐ গুহাতেই বুদ্ধের প্রলোভনের খোদিত ছবিটি অতি সুন্দর! ১ নম্বর গুহায়ও এইবিষয়ে একটি চিত্র আছে বটে, কিন্তু এটি ঠিক অবিকল সে ধরণের নয়। এখানিতেও বুদ্ধদেব গভীর ধ্যাননিমগ্ন, আর ষড়রিপু

নানান মূর্ত্তিতে তাঁর অটল-মন টলাবার বৃথা প্রয়াস পাচ্চে! গুহাটির একধারে বারান্দার ভিতর রেখাবন্দী সারি সারি কতকগুলি সুন্দর ভাবপূর্ণ বুদ্ধ-মূর্ত্তি সজ্জিত।

বস্তুত খোদিত শিল্পগুলি দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায়, অজন্তার শিল্পীরা যে কেবল চিত্রের জন্যই প্রশংসার্হ তা' ন'ন; ভাস্কর্য্যেও তাঁরা জগতের গৌরব-স্বরূপ। খোদিত চিত্রের মূর্ত্তিসকলের গঠন ও সজ্জা চিত্রের গঠনাদির সঙ্গে খুব মেলে।

অনবধানতা বশত অজন্তার 'পরিচয়ে' সেখানকার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য 'সপ্তকুণ্ডের' কথা বলা হয়নি। সেই আশ্চর্য্য দৃশ্যটির কথা উল্লেখ করে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি শেষ কর্‌ব। গুহাশৈলের পাশে যে একটি নির্ঝরের কথা পরিচয়ে উল্লেখ করেছিলুম সেই ঝরণাটি প্রায় তিন শত ফুট উঁচু থেকে প'ড়ে নীচে সাতটি সুবৃহৎ কূপাকার কুণ্ড সৃজন করেছে। সেই স্থানটি এত মনোহর যে বর্ণনার দ্বারা তার রমণীয়তা বোঝাতে পারা যায় না। সেখানকার লোকেরা সেই দর্শনীয় কুণ্ডগুলিকে চলিত-ভাষায় 'খোরা' বলে। সপ্তকুণ্ডের পাশে খাড়া প্রাচীরের মত পাহাড়ের গায়ে একটি অতি আশ্চর্য্য স্বাভাবিক উচ্চ স্তূপ অচলপদ-প্রান্ত থেকে অচল-চূড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাতে আবার ময়ূর, পায়রা প্রভৃতি নয়ন-মনপ্রফুল্লকারী সুন্দর সুন্দর পাখীর বাস। অজন্তার যে স্থানটিতে শিল্পাশ্রমগুলি

রচিত সেখানে মানুষের ক্ষমতা এবং জগৎপাতার অনন্ত সুন্দর রচনার পরিচয় প্রচুরভাবে সমষ্ঠিবদ্ধ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। স্থানটি সত্যসত্যই তাপস, চিত্রশিল্পী ও কবিজন-বাঞ্ছিত। সেই স্বাভাবিক স্তূপ আর কুণ্ডগুলি দেখ্‌তে হ'লে গুহাগুলি যে পাহাড়ের গায়ে খোদিত তার অপর দিকে অর্থাৎ প্রবাহের অপর পাশে একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর উঠ্‌তে হয়। সেখান থেকে নীচে অর্দ্ধ-বৃত্তাকার পাহাড়ের গায়ে খোদিত গুহাগৃহগুলির একা-দিক্রমে সারিসারি সজ্জিত দৃশ্য (Panoramic view) বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর দেখায়! আমরা সেই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠ্‌বার সময় পথিমধ্যে পাহাড়ের গায়ে খোদা কতকগুলি ভাঙ্গা সিঁড়ির ধাপ দেখেছিলুম, তাতে বোধ হয় পূর্ব্বে ভিক্ষুরা ঐ পাহাড়ের উপর ওঠ্‌বার জন্যে প্রবাহের নীচে থেকে সিঁড়ি তৈরী করেছিলেন—কালে সেগুলি আজ ধ্বংশ পেয়েছে !

কবির ভাষায়—অজন্তার অতুল্য-শিল্প-সম্ভার ঐ চিত্র ও ভাস্কর্য্যের ভাব-সম্পদ্ ও পরিকল্পনা একদিকে অনন্ত-অতল পারাবারের মত গম্ভীর ও গরিষ্ঠ, আকাশের মত অসীম, উদার ও নিখিল—অন্যদিকে জ্যোৎস্নার মত মৃদু, তারকার মত উজ্জ্বল, নীহারের ন্যায় সুশীতল !

EXTRACTS.

'The caves of Ajanta' published in 'The Englishwoman' by Mrs. Christiana J. Herringham.

Apart from the intrinsic interest of the frescoes, it must be remembered that they occupy a nearly unique place in the history of art.......Very careful study and rendering of racial, caste, type and colour is a marked characteristic of Ajanta art......We may turn to Brahman romances and plays of the same period such as Kadambari and Sakuntala and find there similar types described in words. The highborn and low-born with their dresses and ornaments are made to live before our eyes in the frescoes, their pleasures , battles, durbars and processions, the palace chambers, lotus-tanks and the best-known animals and birds.

The Indian Drawings by Dr. Ananda K. Coomaraswamy, D. Sc.

" Oriental art, as a whole, is distinguished by its pre-occupation with form and design : it rarely or never transgresses the severity of its convention by endeavouring to create an illusion or to produce an appearance of relief. When gorgeous colouring is lavishy employed the colour occupies clearly defined areas, and only the smallest amount of shading is rendered. Even at Ajanta, where so much stress is laid on colour contrast and the use of black and white in masses, we have an art which is essentially one of draughtsmanship. The most essential part of the technique is the bold, red line-drawing on white plaster, which forms the basis of the painting. Many writers have praised the Ajanta fresco-painter's wonderful command of line. ...... Mrs.

Herringham writes of the drawing at Ajanta, that it is done with a magnificient bravura, giving all the essentials with force or delicacy as may be required, and with knowledge and intention : " the somewhat Calligraphic drawing is so freely executed that "—when most of the colour has worn away, leaving only the under-painting—"one scarcely regrets the destruction which has laid bare such vital work."*

There is a sureness and confidence of touch in these early frescoes which is hardly equalled by that of the Mughal draughtsmen a thousand years later. It is far in advance of any contemporary work in Europe, and it is both severer and more sincerely human than the brush drawing of later Chinese arts. Add to this, there is a grandeur of conception and a nobility of vision in the Ajanta drawing which give to it a position in the history of art which it only shares, perhaps, with the earliest Renaissance Italian.

* 'Burlington Magazine,' June, 1910.

The Paintings in the Buddhist Cave-Temples of Ajanta by Mr. John Griffiths.

I. The artists who painted them were giants in execution. Even on the vertical sides of the walls some of the lines which were drawn with one sweep of the brush struck me as being wonderful; but when I saw long, delicate curves drawn without faltering, with equal precision, upon the horizontal surface of a ceiling, it appeared to me nothing less than miraculous. One of the students, when hoisted up on the scaffolding, tracing his first panel on the ceiling, naturally remarked that some of the work looked like child's work, little thinking that what seemed to him, up there, rough and meaningless, had been laid in with a cunning hand, so that when seen at its right distance, every touch fell into its proper place."

II. The slenderness of the Hindus is always a surprise to the Occidental. These soft and supple forms belong to another world, and their true character seems beyond the grasp of artists accustomed to the antique and to the muscular bulk of European models. At Ajanta no prejudices in favour of a Greek ideal, and no anatomical knowledge vexed the artist's interpretation of the forms he saw. Exaggeration of the long almond-shaped eye is, perhaps the most pronounced mannerism, while to an English observer the familiar Oriental squatting may appear overfrequent. Hands are put in with a prety *maniéré* grace and truth of expression which, to those acquainted with Indian life, is full of suggestiveness.

.... In the paintings, however, there is more feeling of nature. Women are drawn in a great variety of positions, nude or so slightly clad that the shape is nowise concealed.

.... The elusive grace of the half-averted form being charmingly rendered. The draperies, too, are thoroughly understood, and though the folds may be somewhat conventionally drawn, they express most thoroughly the peculiarities of the Oriental treatment of unsewn cloth, which without a single stitch, pin, clasp, button, or other fastening, furnishes the most graceful, convenient and comfortable garments known to mankind.

The Indian Sculpture and Painting by E. B. Havell.

I. Even assuming that Græco-Roman painters and sculptors may have sometimes been the technical teachers in Indian schools, they can no more claim on that account to have inspired Indian art than Shakespeare's schoolmaster can be said to have inspired the tragedies of Macbeth and King Lear.

II. To form a just estimate of any national art we must consider, not what that art has borrowed, but what it has given to the world. Viewed in this light Indian art must be placed among the greatest of the great schools, either in Europe or in Asia. None of the great art-schools are entirely indigenous and self-contained, in the archæological sense; there are none which did not borrow material from other countries, and the schools of Greece and Italy are no exceptions to this rule. India was a borrower like Greece and Italy, but what she borrowed from Persia was, so to speak, a draft on her own bank, a part of the common stock of Aryan culture. What India borrowed from out-side her own world was repaid a hundred-fold by products of her own creative genius. If she took this from here, that from there, so did Greece, so did Italy; but out of what she took came higher ideals than Greece ever dreamt of, and things of beauty that Italy never realized. Let these constitute India's claim to the respect and gratitude of humanity.